শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ

বহু-গ্রন্থ প্রণেতা

ডাঃ সত্যেন্দ্র নাথ রায়

কিতাব মহল

৪৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬

কিতাব মহলের তরফ থেকে
প্রকাশ করেছেন
শ্রীরতিভানু সিংহ নাহর, এম. এ.

ছেপেছেন
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৫৩

মূল্য—৩·৫০

ভূমিকা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত ও উপদেশাবলী অবলম্বনে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একদিন তাঁরই পুণ্যস্পর্শে মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী হয়েছিলেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার অন্ত হয় না। বর্তমান গ্রন্থে যুগাবতারের জীবনদর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই সিউড়ীর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হ'তে প্রকাশিত "ভাবমুখে" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। সেগুলি সংযোজিত ও গ্রথিত হয়ে আজ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হ'ল।

গ্রন্থকার পুণ্যভাগবত জীবনের অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত ক'রে রসপিপাসু প্রেমিকজনের পক্ষে মাধুর্য আস্বাদনের অনুপম সৌভাগ্যের বিধান ক'রে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করবেন সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নেই।

রচনার সাবলীলতা ও ভাবশুদ্ধি সহৃদয় চিত্তমাত্রকেই আবর্জিত করবে। ভাগবতী কৃপা গ্রন্থকারের জীবনকে ধন্য করুক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

১লা বৈশাখ
১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
সংস্কৃত কলেজ

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
এম. এ., ডি-লিট
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ' নামক পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ আজ ঠাকুরের কৃপায় আত্মপ্রকাশ করল। এই পুস্তকখানি নিছক ধর্মগ্রন্থ নয়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক কথার ফাঁকে ফাঁকে সংসারী জীবদের কল্যাণের জন্য যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশগুলিই নবরূপে প্রকাশিত করা হয়েছে অর্থাৎ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা। যার জন্য স্বামিজী বলেছেন—তাঁর এক-একটা কথার দ্বারা এক-একখানা সংহিতা রচিত হতে পারে। এই পুস্তকের মধ্যে ১৬টি অধ্যায় আছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন প্রকাশিত 'ভাবমুখে' নামক পত্রিকায় ২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় সন্ন্যাসী, ত্যাগীভক্ত এবং জনগণ দ্বারা আদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। আশ্রমগুরু শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দজী (Author of World Philosophy) এই রচনাগুলির উচ্চ প্রশংসা তো করেছেনই অধিকন্তু তিনি লেখককে প্রাণ খুলে আশীর্বাদও করেছেন।

ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ. ডি-লিট, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ, তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় পুস্তকের উচ্চ প্রশংসা যেরূপ করেছেন তদ্রূপ তিনি ভাগবতী কৃপা প্রদান করে লেখককে অনুপ্রাণিত করেছেন সন্দেহ নেই। স্বামী সত্যানন্দজী ও ডক্টর শাস্ত্রীর আশীর্বাদ, আমার যাত্রাপথের পাথেয় হবে এ আশা আমি পোষণ করি।

আজ আমার অগণিত সহকর্মীবৃন্দের মনে সতত এই প্রশ্ন জাগরিত হতে পারে—যে ব্যক্তি দীর্ঘ ৩৫ বৎসরকাল রাজনীতি ও সমাজ সেবায় এবং চিকিৎসা বিষয়ের "বিবিধ" পুস্তক রচনা ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজে সদা ছিলেন কার্যরত হঠাৎ তিনি ধর্মজগতে কিভাবে এগিয়ে এলেন ?

মনে রাখতে হবে অঘটন আজও ঘটে—ঠাকুরের কৃপায় সব সম্ভব হতে পারে। তাঁর কৃপায়ই এরূপ পুস্তক রচনা সম্ভব হয়েছে।

এই পুস্তকের মধ্যে যা কিছু মহান, শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় তা ঠাকুরের কৃপা-লব্ধ ; যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকে তবে তার জন্য লেখকই সম্পূর্ণ দায়ী। এই পুস্তক প্রণয়নে ডক্টর অধীর দে, ডি. ফিল-এর প্রেরণা উল্লেখযোগ্য। তিন বৎসর পূর্বে তিনিই আমাকে এবংবিধ পুস্তক রচনা করতে অনুরোধ জানান কিন্তু তখন আমি ছিলাম এবিষয়ে অজ্ঞ কিন্তু এক ঐশী শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছি, হয়তো আরও এগিয়ে যেতে হবে সম্মুখের দিকে। ডক্টর অধীর দে-কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

শুভ ১লা বৈশাখ
১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
১২৭ রামকৃষ্ণাব্দ
৬০ সিমলা ষ্ট্রীট, কলি-৬

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়

সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীগদাধর	...	১—৫
২।	শিক্ষা	...	৬—১১
৩।	স্বাধীনতা	...	১২—১৭
৪।	মন্দির প্রবেশ ও পাঁতি পত্র	...	১৮—২৫
৫।	লোকশিক্ষা ও নারী জাগরণ	...	২৬—৩৩
৬।	স্ত্রীশিক্ষা ও অবতারত্ব সমর্থন	...	৩৪—৪৫
৭।	আঠারটা শক্তির বিকাশ ও শিবজ্ঞানে জীবের পূজা	...	৪৬—৬৬
৮।	যোগ ও বেদান্ত	...	৬৭—৭৪
৯।	কালী ও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সর্ব ধর্মের সমন্বয় জ্ঞান		৭৫—৯৩
১০।	প্রণামতত্ত্ব ও জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে ঈশ্বরের সার রহস্য		৯৪—১০৭
১১।	যত্রজীব তত্রশিব ও ব্রহ্ম মতবাদ	..	১০৮—১২৬
১২।	যত মত তত পথ ও তালে ভঙ্গ না দেওয়া	...	১২৭—১৩৮
১৩।	রামকৃষ্ণ দর্শন	...	১৩৯—১৪৬
১৪।	ব্রহ্মজ্ঞান ও সমদর্শন	...	১৪৭—১৫৬
১৫।	ত্যাগী, সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত এবং কামিনী-কাঞ্চনের কথা	...	১৫৭—১৬৬
১৬।	ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ও অজগরবৃত্তি	...	১৬৭—১৮৩

—উৎসর্গ—

যিনি মহা-প্রয়াণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও অকাতরে জনগণের সেবা ও দেশ সেবা করে গেছেন

যিনি নামের মোহ বর্জন করে গঠনমূলক, শিক্ষামূলক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন

যিনি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন·

সেই মহাপ্রাণ, দানবীর মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি অর্পিত হ'ল।

—সত্যেন রায়

১লা বৈশাখ, ১৩৫৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও দেশ

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্রীগদাধর

উনবিংশ শতক ভারতের স্বর্ণময় যুগ। এই যুগে বাংলা দেশে সাধু-সজ্জন, ত্যাগী-মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে গেছেন। এই শতকে আমরা দেখতে পাই রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, দেশপ্রেমিক অশ্বিনী দত্ত, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বিপিন পাল ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে। কিন্তু দেশের বিবিধ প্রকারের সমাজ-সমস্যা সমাধানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের নাম চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। গুরু শিষ্য দুজনে ধর্মের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী যে শিক্ষা দিয়েছেন তা অতুলনীয়।

দেশ যখন অস্পৃশ্যতার নাগপাশে ছিল বদ্ধ, অভাব-অনটন অশিক্ষা ছিল যখন অত্যধিক, কথায় কথায় যখন নিম্নজাতের লোকদের নিগ্রহ ও মাতৃজাতির প্রতি নিপীড়ন চলতো, যখন চতুর্দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় মান, খ্যাতি লাভের আশায় দলে দলে খ্রীষ্টান হবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তরুণ গদাধর রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে পূজারির পদ গ্রহণ করে মাতৃসাধনায় আত্মনিয়োগ করে ধাপে ধাপে সর্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, 'যত মত তত পথ ও যত্র জীব তত্র শিব'-এর মর্মবাণী উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 'যত মত তত পথ' বলবার একমাত্র অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণই। কারণ তাঁর পূর্বে পৃথিবীর কোন মনীষী বা সাধুসজ্জন এরূপ সরলভাবে যত মত তত পথের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় বাল্যকাল হতেই অনুভব করেছিলেন যে, অস্পৃশ্যতা দেশে থাকলে, দেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই আদর্শ

স্থাপনের জন্য বাল্যকালেই তিনি এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর উপবীত গ্রহণের সময়। দেশপ্রথা অনুযায়ী উপবীত গ্রহণের সময় তাঁর ভিক্ষার ঝুলিতে প্রথম ভিক্ষা প্রদান করবেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু গদাধর তাঁর উপবীত গ্রহণের সময় জিদ ধরলেন—শূদ্রাণী ধনীকামারনীই প্রথম ভিক্ষা প্রদান করবেন ভিক্ষার ঝুলিতে। বাধা এসেছিল খুবই কিন্তু সকল বাধাই গদাধর অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতকে অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল শক্তই ছিল। উচ্চজাতের মানুষ নিম্নজাতের মানুষকে স্পর্শ করতে রীতিমত ঘৃণা বোধ করত, খেলাধূলার কথা তো উঠতেই পারে না। অথচ সেই যুগে গদাধর নিম্নজাতের কিশোরদের সাথে অবলীলাক্রমে খেলা করেছেন। নির্ভাবনায় যাত্রাটাত্রাও মাঝে মাঝে করতেন। বর্তমান শতকে যদিও এটা এমন কিছু নিন্দনীয় কার্য নয়, কিন্তু সেই যুগে সাংঘাতিক ছিল বৈ কি!

কামারপুকুরে পণ্ডিত ক্ষুদিরামই ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশের সন্তান, কিন্তু এঁরা ছিলেন উদারপন্থী—তা না হলে পণ্ডিত রামকুমার রাণী রাসমণিকে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগ দেওয়ার অনুমতি দিতে সাহসী হতেন না—যেখানে অন্যান্য পণ্ডিতেরা পাঁতিপত্র দিয়ে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এঁরা উদারপন্থী ছিলেন বলেই তেলি, মালি ও অন্যান্য নিম্নজাতের কিশোরদের সাথে মিশবার সুযোগও গদাধর পেয়েছিলেন এবং এদের আপদে বিপদে বিবিধ প্রকারের সাহায্য করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কামার-পুকুরে একমাত্র ক্ষুদিরামই ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর সবই ছিল নিম্নজাতের ইতর সাধারণ লোক। এই সব লোক গদাধরকে অন্তরের সাথে ভক্তি করত। গদাধর এই নিম্নজাতের দীন দরিদ্রদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে জানতে পেরেছিলেন এদের অভাব অভিযোগ, অশিক্ষা এবং ঘর-গৃহস্থালীর কথা, এদের সর্ব প্রকারের উন্নতি কি ভাবে হতে পারে, দেশের অস্পৃশ্যতা দূর করবার উপায় কি ইত্যাদি।

অনুমান করা শক্ত নয়, এইসব বিষয়ের আদর্শ স্থাপনের জন্যই রামকৃষ্ণ কৈবর্ত (মাহিষ্য) প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১১৩ বৎসর পূর্বে দেশের সামাজিক অনুশাসন অত্যন্ত কঠোর ছিল। মা ভবতারিণীর কাছ থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠার ও অন্নভোগের প্রত্যাদেশ পেয়েও রাণী রাসমণির ন্যায় বিত্তশালিনী মহিলাকে চোখের জলে ভাসতে হয়েছিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনুমোদন না পেয়ে। অবশ্য পণ্ডিত রাজকুমারের ব্যবস্থাপনায় মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হল কিন্তু পূজারী কোথায়? রাসমণি অনেক চেষ্টা করলেন পূজারীর জন্য। ব্রাহ্মণদের অভিমত এই যে, শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা তাঁরা করতে পারবেন না, এমন কি মাথাও নোয়াবেন না শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবতার সম্মুখে। উদারপন্থী মানবদরদী পণ্ডিত রামকুমার এলেন রাণী রাসমণির অনুরোধে মা ভবতারিণীর পূজার ভার গ্রহণ করতে, গদাধরও ছিলেন দাদার সাথে। গদাধর কিছুদিন পর্যন্ত নৈষ্ঠিক আচারির ন্যায় ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। মন্দিরের বাইরেই তিনি গঙ্গাজলে ভাতেভাত সিদ্ধ করে খেতেন, শিবলিঙ্গ তৈরী করে পূজোও করতেন মন্দিরের বাইরে। তারপর তিনি মথুর বাবুর অনুরোধে এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের আশ্বাসবাক্যে রাণীর মন্দিরে পূজার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি বলতেন, আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতুম আমার বিচারবুদ্ধির উপর বজ্রাঘাত করতে। তিনি সর্বধর্মের অনুভূতি লাভ করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন—মায়ের আরাধনায়, মায়ের পূজায় সকলের সমান অধিকার আছে। লোকশিক্ষা ও আত্মতৃপ্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টধর্ম ও মুসলমান ধর্মের সাধন করেন। তোতাপুরীর নিকট বেদান্তের ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে তন্ত্র ও যোগ-সাধনা শিক্ষা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই তিনি দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন "যত মত তত পথের"র বাণী। তাঁর মতে যাদের সংকীর্ণ মনোভাব তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে

শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়। যাঁরা ঈশ্বরানুরাগী, কেবল সাধন ভজনই করেন, তাঁদের ভেতর কোন বিদ্বেষ ভাব থাকে না। সাধুসজ্জনরা বলেন, সত্যিকারের ডাকার মত যদি ডাকা যায় তবে খ্রীষ্টান মুসলমান, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, রামাৎ প্রভৃতি যে কোন সম্প্রদায়ের লোক মায়ের করুণা লাভে সমর্থ হবেই। যে রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অন্নভোগের ব্যাপার নিয়ে দেশের চতুর্দিকে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল, আজ সেই মন্দির পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়েছে। সেখানে ভারতের সকল রাজ্য থেকেই সর্বস্তরের মানুষ মাতৃপূজা দর্শন করতে সমবেত হচ্ছেন, আজ আর সেখানে কোন ভেদাভেদ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—সরল হওয়া, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, ও শিবজ্ঞানে নরনারায়ণের সেবা করা। সেবাই পূজা, সেবাই উপাসনা। প্রথম ভগবানের সেবা তৎপর জগজ্জনের সেবা, জগজ্জনের সেবার অর্থই নরনারায়ণের সেবা। এরই জন্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রেঁমারেঁালা বলেন,—

আমি ইউরোপের জন্য এক নবীন শরতের কমল এনেছি, এনেছি আত্মার এক নূতন বাণী ভারতের মহাসঙ্গীত। এ মহাসঙ্গীতের নাম রামকৃষ্ণ। * * যে মানুষটির মূর্তিকে আমি এখানে কল্পনায় রূপ দিতে চাই, ত্রিশকোটি নরনারীর তুই সহস্র বৎসরব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ তিনি। তিনি গান্ধীর মত কর্মবীর ছিলেন না, ছিল না তাঁর গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্প বা চিন্তার প্রতিভা। তিনি ছিলেন বাংলার ক্ষুদ্র এক গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ। তাঁর বহির্জীবন ছিল সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাতে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ছিল না এবং ছিল না সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনীতিক কোন কর্মচাঞ্চল্য কিন্তু তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবনে বহু বিচিত্র মানব ও দেবতার সমন্বয় ঘটেছিল। বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য মানুষটি কান পেতে নিজের অন্তরের বাণী শুনেছেন, তাই তিনি অন্তর সমুদ্রের পথের সন্ধান পেয়েছিলেন।

* * *

এর পর প্রাণস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেন—এই ভাবে সরল রামকৃষ্ণের চরণে অতিজ্ঞানী অতিউদ্ধত বর্তমান ভারতের মহান ধর্মচেতনায় গর্বিত সকলেই আত্মনিবেদন করেছিলেন। দেবমানব রামকৃষ্ণের জীবনের মধ্য দিয়ে দিব্য আলোক গত শতাব্দীর ঘন অন্ধকার বিনাশ করে তরুণ বঙ্গ তথা তরুণ ভারতকে উদ্ভাসিত করেছিল। তরুণ বঙ্গের নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের অগ্রগামী-বৃন্দ তাঁকে আশ্রয় করে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) পূতস্পর্শে এসেছিলেন বলেই আপামর সর্বসাধারণ দ্রুত-উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেন—**পাঁচশত বৎসরের** মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব পৃথিবী সহ্য করতে পারবে না। তাঁর চিন্তার প্রাচুর্য যা তিনি রেখে গেছেন, তা আমাদের কার্যের মধ্যে রূপান্তরিত করতে হবে; ঐশী শক্তির প্রেরণাকে প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নূতনের সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অধিকার কোথায়? নূতন নিয়েও আমরা কি করব?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে,
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

শিক্ষা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

—পরমানন্দ মাধবের কৃপা হলে পর মূক যে—সেও ভাষা পায়, পঙ্গু অর্থাৎ খোঁড়া—সেও পারে পর্বত আরোহণ করতে।

এ কথার কথা নয়, অথবা পুরাণাদি গ্রন্থাবলীর নিছক গাল-গল্প নয় বা স্বপ্নের ছায়া বা কবির কল্পনা নয়, এ অতি খাঁটি সত্য কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বললেন, আমি তোর সাথে যেমনটি কথাবার্তা বলছি ঠিক সেইরূপ আমার মৃন্ময়ী মায়ের সাথেও কথা কই, মনের ব্যথা ও কথা তাঁকে জানাই, গূঢ় সমস্যা সমাধান করতে মায়ের উপদেশও গ্রহণ করি। মৃন্ময়ী মা আমার চিন্ময়ীরূপে আমার সাথে কথা বলেন, উপদেশ দেন। মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তখন আর তিনি মৃন্ময়ী থাকেন না, তখন তিনি চিন্ময়ী হয়ে কথা কন, দেখা দেন, সন্তানের সাথে হাসেন, কাঁদেন। সুতরাং মায়ের কৃপা হলে নিরক্ষর মূকতুল্য ব্যক্তি, যার ভাষা নেই, তিনিও ভাষার ফোয়ারা ছোটাতে পারেন, পারেন ঈশ্বরীয় বিষয়বস্তুর সরল ব্যাখ্যা করতে। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত "রাখতুরাম" বা লাটু।

কলিকাতা সিমলা পাড়ার (প্রাক্তন সিমুলিয়া) ডাঃ রাম দত্তের তখন খুব নামডাক। পাড়ায় রাম দত্ত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, সবাই তাঁকে খুব খাতির আত্তি করে। তাঁর বিহারী চাকরটির নাম রাখতুরাম। রাম দত্ত ডাকতেন 'লালটু' বলে। ছেলেটি বড় ভাল। ঘটনাচক্রে রাখতুরাম এল রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে। রামকৃষ্ণ ছোট নাম রাখলেন "লাটু"। লাটুর নির্ভরতা দেখে নিরক্ষর লাটুকে বর্ণ পরিচয় শেখাচ্ছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বয়ং। স্বরবর্ণ শেষ করে

ব্যঞ্জনবর্ণ পড়াচ্ছেন ঠাকুর। রামকৃষ্ণ লাটুকে বলছেন, পড়্ "ক"! লাটু পড়ছেন, "কা"। রামকৃষ্ণ যত বলেন ওরে "কা" নয়—"ক", ততই লাটু পড়ছেন "কা"। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন বললেন, ওরে "ক" কে যদি "কা" বলবি তবে "ক" এ আকার দিলে কি বলবি? যা শালা! তোর আর পড়তে হবে না। মিলল লাটুর ছুটি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে ভার নিলেন লাটুর, তাঁর আর পরীক্ষার পড়া পড়তে হবে না। লাটু আজ প্রকৃত জ্ঞান লাভের নেশায় মশ্‌গুল। লাটু এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে পরাবিদ্যা অর্জন মানসে। ডাঃ রাম দত্তের নিরক্ষর চাকর রাখতুরাম রূপান্তরিত হলেন লাটু মহারাজে। যিনি একদিন ব্যঞ্জনবর্ণের আদি অক্ষর শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারছিলেন না সেই রাখতুরাম আজ বেদ-বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতা ও পুরাণাদির সরল বর্ণনা করছেন। আজ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনবার জন্য এবং তাঁর দর্শনমানসে কত বিদ্বান, সাধু-সজ্জন লালায়িত।

যে যুগে মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস বা ছাড়পত্র না পেলে মানুষ বলে পরিচিত হত না সেই যুগে নিরক্ষর লাটু জ্ঞানে, সাধনায় ও পরাবিদ্যায় কত উচ্চে উঠেছিলেন তা আমরা কল্পনা করতে পারি না, কিন্তু এর উপমা একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই কেবল।

হলধারী মস্ত বড় পণ্ডিত, গদাধরের আত্মীয়।

হলধারী গদাধরকে তাচ্ছিল্যভরে বললেন, তুই শাস্ত্র কিছু জানিস্?

উত্তরে গদাধর বললেন, খুব—

হলধারী কটাক্ষ করে বললেন, কি ভাবে জানিস্? তুই তো একটা অকাট্ মুখ্খু।

উত্তরে গদাধর বললেন, আমি মুখ্খু হলে কি হবে—আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি তো আর মুখ্খু নন। তিনিই সকল ভাষা ও সকল তথ্য আমায় বুঝিয়ে দেন।

সর্বজ্ঞানে, সর্বভাবে, সর্ব-সাধনায় রামকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধ, তাই তিনি আজ পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের মূর্ত বিগ্রহ। হলধারী একাই যে

এরূপ ভুল করেছিলেন তা নয়, এরূপ ভুল রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য নরেন দত্ত করেছেন বহুবার। একদিন কথায় কথায় নরেন বললেন, তুমি দর্শন শাস্ত্রের কি জান? তুমি তো একটা মুখ্খু।

ঠাকুর তদুত্তরে রসিকতা করে বললেন, মুখ্খু যত ভাব তত নই, 'অক্ষর জ্ঞান' আমার আছে, পাঠশালায় দিন কয়েক পড়েছি তো।

গিরিশ ঘোষও যে এ ভুল করেন নি তা নয়। যদিও গিরিশ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না তত্রাচ নরেনের কাছে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তোমরা সব পণ্ডিত মানুষ আর রামকৃষ্ণ লেখাপড়া জানেনা ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ এর উত্তরে বলতেন, তা ত ঠিকই, তোরা গাদা গাদা বই পড়িস আর আমি সারটুকু গ্রহণ করি। যেমন, দুধে জলে মিশিয়ে দিলে হাঁস দুধটুকু পান করে জলটুকু ফেলে দেয়। আমিও বেদ-বেদান্তের সার **ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা** ও বেদান্তের সরল কথা **ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট** বুঝেছি, বুঝেছি গীতার সার ত্যাগী। সুতরাং গাদা গাদা বই পড়ে কি হবে? এসব জানবার পর আমি রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, এগিয়ে চলেছি সম্মুখের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—এগিয়ে চল্ সম্মুখের দিকে, সাধনায় সিদ্ধি-লাভ হবেই, ডুব দে অগাধ সমুদ্রে, মণিমুক্তা পাবেই। তবে উপর উপর ভাসলে চল্‌বে না। পরা-বিদ্যায় যিনি সিদ্ধ তাঁর কাছে অপরা-বিদ্যার কোন মূল্য আছে কি? তাই রামকৃষ্ণের সরল শিক্ষা, "অসার ফেলে দিয়ে সারটুকু গ্রহণ কর।"

যে যুগে ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাই ছিল শিক্ষা এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপই ছিল উচ্চশিক্ষার মানদণ্ড, যে যুগে শূর ও সূরী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ, ডি, এল, রায় প্রভৃতির রাজত্ব, সেই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখালেন—পুঁথির বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করে জলটুকু ফেলে দিতে হবে। তন্ময় হয়ে বনে, মনে ও কোণে

সাধনা করতে হবে। অহমিকা বর্জন করে সর্বশক্তির আধাররূপিণী মায়ের আরাধনা করতে পারলেই তবে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় হবে।

গিরিশ যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে বকল্‌মা দিলেন তারপরই তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন পরাবিদ্যা। গিরিশ বকল্‌মা দেবার পূর্বে ছিল অকাজ কুকাজের রাজা, সে ছিল মদ্যপ ও চরিত্রহীন। আর আজ সেই গিরিশ মহাকবিরূপে দেশ ও জাতির কাছ থেকে পাচ্ছেন পূজা। কেবল কি তাই—উনবিংশ শতকের শেষভাগ ছিল স্বর্ণযুগ, সেই যুগে কত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ছিল দেশে—গ্র্যাজুয়েটের তো ছড়াছড়ি কিন্তু মহাবীর অর্জুনের ন্যায় একক পৃথিবী জয় করেছিলেন তরুণ গ্র্যাজুয়েট নরেন্দ্রনাথ প্রকৃত পরাবিদ্যার জৌলুসে। এ শক্তি তরুণ নরেন দত্ত পেলেন কার কাছ থেকে? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চক্ষে পথ প্রদর্শক ও পরাবিদ্যার প্রকৃত গুরু।

রামকৃষ্ণ দেশবাসীকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন—তোমরা যাকে মূর্খ অপোগণ্ড মনে করে দূরে ফেলে রেখেছ তাদের মধ্যেও শক্তির বিকাশ হতে পারে, তোমরা যাদের অবজ্ঞা কর, তারা যদি রীতিমত ভাবে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায়, তারা যদি অগাধ সমুদ্রে ডুব দেয় তাহলে তারাও মণিমুক্তা আহরণ করে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি বলা যায়—তা হলে আমরা কি দেখ্‌তে পাই?

নোবেল পুরস্কার লাভ করবার আগে পর্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের শূর ও সূরীদের নিকট ছিলেন অপাংক্তেয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের একটাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। এমন যে কাব্যবিশারদ, তিনিও ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—

রবি তুই পায়রা কবি—
খোপের ভিতর থাক্ ঢাকা।

তোর বক্‌বকানি খপ্‌খপানী,
তাও কবিত্বে ভাব মাখা,
তাও ছাপালি বিক্রী হ'ল
নগদ মূল্যে এক টাকা—"

রবীন্দ্রনাথকে কেবল যে কাব্যবিশারদ মহাশয়ই ঠাট্টা করেছেন তা নয়! ডি, এল, রায় হতে তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে মূর্খ কবি বলতে একটুও কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন পৃথিবীর অপরাপর দেশ রবীন্দ্রনাথকে সম্মানে ভূষিত করেছেন তখন বাংলার শূর সূরীদের মধ্যেও আরম্ভ হল সম্ভাষণ জানাবার প্রতিযোগিতা। এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডক্‌টরেট উপাধি ও বৃটিশ সরকার স্যার উপাধি দিতে দ্বিধা বোধ করলেন না।

আজ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তাঁর আসন আজ বহু উর্ধ্বে। গিরিশের বেলাও এই কথা প্রযোজ্য। আজ গিরিশ মহাকবি, তিনি জাতির একটি স্তম্ভ।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষার মাপকাঠী ছিল উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা। সে যুগে যে মানুষ কথায়, লেখায় ও বক্তৃতায় ইংরাজী বুলির ফুলঝুরি উড়াতে পারতেন তিনি সেই যুগের শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করতে পারতেন, সাধন-ভজন আরাধনা প্রভৃতি ছিল গৌণ। ঐ যুগে আবির্ভূত হলেন শ্রীগদাধর—মানুষের অপরাবিদ্যার অহমিকা ভেঙ্গে চুরমার করবার জন্য। তিনি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে দেখালেন, সামান্য অক্ষরজ্ঞান যার আছে তিনিও সাধন-বলে বেদবেদান্ত, গীতা উপনিষৎএর সার বস্তু পারেন আহরণ করতে। তিনি পৃথিবীবাসীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন—অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও সাধনবলে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায়। তিনি দেখালেন সামান্য একজন গ্র্যাজুয়েট সাধনবলে ও পরাবিদ্যার প্রভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করবার শক্তি রাখেন। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে লাটু-মহারাজ, বিবেকানন্দ, গিরিশ ঘোষ এবং মনীষীবৃন্দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথার প্রতিধ্বনি পাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে। শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—সুশিক্ষা প্রচলন করা জাতীয় সরকারের কর্তব্য কিন্তু এতৎসঙ্গে দেশের জনগণেরও সহযোগিতা কাম্য। শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথা আমার বলার আছে—ভারতবর্ষের বুকের উপর যতকিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে শিক্ষার অভাবকে কেন্দ্র করে। তাই চাই সুশিক্ষা, সুশিক্ষা দেশে প্রচলিত হলে সব আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। কবিগুরু এখানে সুশিক্ষা বলতে পরাবিদ্যার কথাই উল্লেখ করেছেন বলেই আমার মনে হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দ্বারা জাতিভেদ, ধর্মরোধ, ও কর্মজড়তা প্রভৃতি দূর হতে পারে না। পরাবিদ্যার প্রভাব ও প্রকৃত সাধনা শিক্ষার সঙ্গে না থাকলে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ হয় না। সত্যিকারের জ্ঞান হলেই সর্ববিদ্যার সার লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও লাটুমহারাজ নিরক্ষর হয়েও পরাবিদ্যার প্রভাবে প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে জগৎকে নূতন আলো প্রদানে সমর্থ হয়েছিলেন।

আজ জাতীয় সরকারও ঘোষণা করেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের মাপকাঠি দ্বারাই কর্মীর কার্যশক্তির বিচার হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপশূন্য ব্যক্তিও যদি প্রকৃত জ্ঞানী ও কর্মে পটু হন তবে ছাপের চাইতে অছাপের মূল্য অনেক বেশী। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দৃঢ়ভাবে বলা যায়, মানুষকে মানুষের আসনে আসীন করবার বীজ বপন করেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস উনবিংশ শতকের শেষার্ধে।

স্বাধীনতা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা ঘোষণা করলেন, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার? কিন্তু রামকৃষ্ণ ঐ দিক দিয়েই গেলেন না, তিনি সহজভাবে মহাকবি কালিদাসের কথায় বললেন,—অন্নচিন্তা চমৎকারা। পেটে খিদে নিয়ে ধর্ম হয় না। যতক্ষণ পেটে অন্ন নেই ততক্ষণ সংসারে রস নেই, নেই তার কাছে ঈশ্বর। পেটে অন্ন না থাকলে সে "জড়পিণ্ডের মত"। এর পরই একটি সুন্দর উপমা দিলেন,

"অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হলো বুদ্ধিহারা!"

স্বাধীন সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ সভাকবি এমন যে কালিদাস—তাঁরও যখন অন্নচিন্তা মনের মধ্যে জাগরিত হ'ল তখনই তাঁর গবেষণা, অনুশীলন, তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁর বিচারশক্তির কৌশল ও বাগ্মিতা লুপ্ত হয়ে গেল। অতএব দেখা যাচ্ছে অন্নময়ী শক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির আধাররূপিণী।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার সন্দেহ নেই। কিন্তু পেটে যখন অন্নের অভাব থাকে, পরিবার পরিজন যখন বুভুক্ষু থাকে তখন তার স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ, সাধন, ভজন, শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি শক্তিগুলি লুপ্ত হয়ে যায়।

তাই দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর নগ্নরূপ দেখে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জলদগম্ভীর নিনাদে বলে উঠলেন,—যতদিন ভারতবর্ষের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন আমার মুক্তি নাই! এর ভাবার্থ, কোটি কোটি বুভুক্ষু নরনারী যে দেশে বিরাজমান সেই দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব! তখন বড় দুঃখেই নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শাস্ত্র-মাস্ত্র এখন গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে মানুষকে খেতে দিয়ে বাঁচা!

গুরু রামকৃষ্ণ যে কথা বলেছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পেয়েছিলেন পর্যটক বিবেকানন্দরূপে। তিনি ভাল ভাবে অনুভব করলেন, অন্নকষ্ট থাকলে মানুষ কোন মহৎ কার্যই সম্পন্ন করতে পারে না। অন্নকষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য গান্ধীজী তাই বললেন, ভারতবর্ষের সর্বমঙ্গল হতে পারে কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথের মাধ্যমে। যতক্ষণ মানুষ সমবায়ী-ভাবাপন্ন না হবে ততক্ষণ দেশের কল্যাণ অসম্ভব। দশে মিলে চাষ-আবাদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য করবার প্রবল ইচ্ছা জাগরিত না হলে দেশে সুখ-শান্তি আসবে না, বা আসতে পারে না।

অন্ন-বস্ত্রের অভাব থাকলে এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার কাঠামো যে কোন মুহূর্তে তাসের ঘরের ন্যায় উড়ে যেতে পারে। আজ দেশে অশান্তি, বিক্ষোভ, ঝগড়া, বিরোধ সমস্তই অন্নের জন্য। যে দিন মানুষ পেটভরে খেতে পাবে সেই দিনই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা ও শান্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলে হিংসা দ্বেষ স্বার্থ-পরতা দূর হয়ে সেখানে ফুটে উঠবে ভালবাসা। লোভাদি চলে গিয়ে জেগে উঠবে প্রেম, মৈত্রী ও শ্রদ্ধা। অভ্যুদয় হবে দেশগঠনের প্রবৃত্তি।

"বসুধৈব কুটুম্বকম্।" শাস্ত্রকারের কথার সুরই গান্ধীজীর কথার মধ্যে পাওয়া যায়। আপনারে লয়ে বিব্রত থাকলেই চলবে না, সকলের তরে সকলে আমরা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে না পারব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরস্পর পরস্পরকে কোলে টেনে নিতে না পারব ততক্ষণ আমাদের অন্নকষ্টের সুরাহা হবে না। আমাদের মুক্তির ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে থাকবে প্রচণ্ড বাধা। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মূলমন্ত্রই হল অন্ন-চিন্তার হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচান। অন্নচিন্তা থাকলে ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম প্রভৃতির বিকাশ হয় না বা হতে পারে না। বিবেকানন্দের "মিশন প্রবর্তনের" উদ্দেশ্যও তাই। সেবাধর্মের

মাধ্যমে কোটি কোটি নিরন্ন জনগণের সেবা। তাদের খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, রোগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং পরাবিদ্যার প্রভাবে তাদের চোখের সম্মুখের কালো পরদা অপসারণ করে উজ্জ্বল আলো তুলে ধরা। গুরু রামকৃষ্ণের বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন বলেই স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলতে পেরেছিলেন -স্বাধীনতা আয়ত্ত করতে পারে একমাত্র বীর ও সাহসী ব্যক্তি—ভীরু কাপুরুষের জন্য স্বাধীনতা নয়। ভারতীয়দের স্মরণ রাখতে হবে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কথা, স্মরণ রাখতে হবে মুচী, মেথর ও অশিক্ষিত দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসী আমাদেরই ভাই এবং আমাদেরই স্বদেশবাসী, অতএব এদের মঙ্গল না হলে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল হতে পারে না। এখানেও সেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

গুরু যেমন অচলায়তনের বেড়াজাল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, প্রত্যেকটি মানুষের মাতৃআরাধনা করবার অধিকার আছে, মাকে ডাকতে কোন জাতের বাধা নেই এবং পেট ভরে না খেলে ধর্ম কর্ম হয় না, শিষ্য বিবেকানন্দও বললেন, এদের মুখে দিতে হবে ভাষা, ক্ষুধার অন্ন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রধান অন্তরায় ছিল—অন্নকষ্ট, অশিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা। এই তিন "অ"এ মিলে দেশে দেখা দিল অনিয়ম, অপচয়, অত্যাচার ও অসাধুতা। রামকৃষ্ণ এই তিন "অ"-এর মূলে কুঠারাঘাত হানলেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশে অন্নকষ্ট থাকলে পর মানবতার বিকাশ হতে পারে না, থাকে না কর্মশক্তি ও আত্মশক্তি। রামকৃষ্ণের উক্তি যে কত সত্য ও জীবন্ত তা আমরা দেখেছি কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সময় এই কলিকাতা মহানগরীতে; অন্নাভাবে মানুষ তখন মানুষ ছিল না। তার মনুষ্যত্ব, ঐতিহ্য, সাধনা, বংশ-মর্যাদা, শিক্ষা, আচার ব্যবহার সমস্তই ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। ক্ষুধার তীব্র তাড়নায় আত্মবিক্রয়, সন্তান বিক্রয় এবং মর্যাদা বিক্রয় করতেও

দ্বিধাবোধ করে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় কুকুরে মানুষে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে। তারপর ছিন্নমূলদের কথা ভেবে দেখলে পর রামকৃষ্ণের কথার গুরুত্ব ভালভাবেই বুঝা যাবে। যাদের একদিন ছিল উচ্চশিক্ষা, সাধনা, একতা ও দেশাত্মবোধ, যাদের বারো মাসে হোত তের পার্বণ, যাদের স্ত্রী-কন্যারা একদিন ছিলেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী ও অসূর্যম্পশ্যা, আজ ক্ষুধার জ্বালায় তারা কোন্ পথের যাত্রী—ভাববার কথা নয় কি? তাই রামকৃষ্ণ কালিদাসের কথায় বললেন—

—অন্ন চিন্তা চমৎকারা—

এর মধ্যে ঘোর প্যাঁচ কিছু নেই, আছে মূর্তিমান সত্য। ক্ষুধার তীব্র জ্বালার সময় পেটে গামছা বেঁধে কোন মহৎ কাজ হয় না বা হতে পারে না। অন্নহীনের পেটে নিয়মমত অন্ন পড়লেই তখন তার ধীশক্তি, কার্যকরীশক্তি ও অধ্যাত্মশক্তির হবে বিকাশ ও প্রকাশ। অতএব রামকৃষ্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বড় বড় কথা না বলে ছোট একটি কথা দ্বারাই সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আর একটি অন্তরায় অস্পৃশ্যতা, এই অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্যও তিনি অসাধ্য সাধন করে গেছেন। তখন অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল যে কত শক্ত ও সুদূরপ্রসারী ছিল তা বিংশ শতকের শেষার্ধের তরুণ ও কিশোরের দল কল্পনাও করতে পারে না। যে দেশে অস্পৃশ্য মানবের ছায়া মাড়ানও পাপ ছিল, ছায়া মাড়ালে গঙ্গা-স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করবার বিধি ও বিধান ছিল—সেই যুগে রামকৃষ্ণ শূদ্রাণীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করলেন তাঁর উপবীতের সময়। যখন উচ্চজাত ও নিম্নজাতের মধ্যে অচলায়তনের প্রাচীর ছিল অত্যন্ত শক্ত—সেই যুগে তিনি কৈবর্তবাড়ীর পূজারীর পদ গ্রহণ করেন এবং কৈবর্তকে করেন মন্ত্রশিষ্য। যে দেশে কুকুর ও অপরাপর পশু গৃহে প্রবেশ করিলে কিছু হতো না কিন্তু যে মুহূর্তে অজ্ঞ এক অস্পৃশ্য মানবশিশু ভুলক্রমে উচ্চজাতের গৃহে প্রবেশ করলো অমনি চতুর্দিক থেকে শিশু ও শিশুর পিতার উপর

হোত অত্যাচার ও নিষ্পেষণ। তারপর সেই শতকে মন্দিরের চূড়া দর্শনই ছিল অস্পৃশ্য জাতির ভগবান দর্শনের ফল, মন্দিরে বা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা ছিল তাদের নিকট স্বপ্ন বা আকাশকুসুম, যদি ভুলক্রমে কোন অচ্ছুৎ মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করল অমনি পুরোহিত ও রাজপুরোহিতের অনুশাসনে হ'ত সেই হতভাগ্যের মৃত্যুদণ্ড—না হয় কঠোর শাস্তি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যদিও পতিত উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু তিনিও তৎকালীন সমাজের অনুশাসন ও বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। তিনিও ভক্ত হরিদাস ও রূপ-সনাতনকে পরম বৈষ্ণব জেনেও বহুদূর হতে মন্দিরের চূড়াদর্শনেই ভগবান দর্শনের ফল পাওয়া যাবে বলে—তৎকালীন সামাজিক আচার বিচার মেনে চলতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মনের প্রসারতা ছিল সমুদ্রবৎ, তিনি সামাজিক অনুশাসন গ্রাহ্য না করে চরিত্রহীন মদ্যপ ও অকাজ কুকাজের রাজা গিরিশের সম্পূর্ণ ভার তো গ্রহণ করলেনই অধিকন্তু নরেনকে (স্বামী বিবেকানন্দ) ব্রাহ্মভাবাপন্ন জেনেও (তখন ব্রাহ্মদের ম্লেচ্ছ বলা হত) রামকৃষ্ণ তাঁকে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে বর প্রার্থনা করতে বললেন। এরূপ একবার বলেন নাই, তিন তিন বার বলেছেন—"যা, মাকে তোর অভাবের কথা বল, এখন মায়ের কাছে তুই যা চাইবি তাই পাবি।" কেবল তাই নয়—বলরামের অন্ন-শুদ্ধ একথাও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন। এখানে শিষ্য বিবেকানন্দও লোকশিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে চমৎকার কথা বলেছেন,—আমার মনে হয় দেশের ইতর সাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং অবনতির কারণ। যতদিন জনসাধারণ উত্তম শিক্ষা না পাচ্ছে, যতদিন তারা পেট ভরে খেতে না পাচ্ছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন তাদের আপন জন করে না নিতে পাচ্ছে ততদিন রাজনীতির যতই আন্দোলন হোক না কেন কিছুতেই কিছু হবে না বা হতে পারে না। এখানেও সেই অন্নচিন্তা চমৎকারার ধ্বনিই

শোনা যাচ্ছে বিবেকানন্দের মুখে—আর শোনা যাচ্ছে অস্পৃশ্যতা বর্জন নীতির কথা। দেশে প্রকৃত মানুষ দেখা যায় না বলেই রামকৃষ্ণ 'মানুষের' ভারি চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন—মান+হুঁশ=মানুষ, যার নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে সেই মানুষ অর্থাৎ মান-হুঁশ যে, সেই মানুষ। এর ভাবার্থ "আমি অমৃতের সন্তান, আমি সর্বেশ্বর।" যখনই নিজেকে অমৃতের সন্তান বলে ধারণা হবে তখনই ভেদাভেদ চলে গিয়ে মানুষ মানুষকে 'মানুষ' বলে ভাবতে পারবে।

যখন আমরা নিজেদের অমৃতের সন্তান বলে মনে করতে পারব তখন আর আমাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, হীনতা, নীচতা এবং স্বার্থপরতা থাকবে না। তখন আমাদের প্রয়োজন হবে না অপর দলকে নিম্নে ফেলে দিয়ে দল পাকাবার—তখন প্রয়োজন হবে না অপর কোন ধর্মকে ও ধর্মবিশ্বাসীকে নিন্দা করবার; তখন আমাদের কাছে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, রামাৎ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও মুস্লিম সবই এক হয়ে যাবে। তখন এ ধর্ম বড়, ও ধর্ম ছোট, এ পথ ভাল, ঐ পথ মন্দ এ জ্ঞান থাকবে না। তখন নিজের গায়ে সাইন বোর্ড মেরে নিজেকে সাধু বলে জাহির করবারও প্রয়োজন হবে না। তখন রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ'কেই শ্রেষ্ঠ পথ বলে বেছে নিয়ে সংসার-কেল্লার মধ্যে থেকেই সংগ্রাম করে সর্ববিষয়ে উন্নত হয়ে অন্নচিন্তার হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারব এবং নিজেও বাঁচতে পারব। অর্থাৎ মান-হুঁশ হতে পারলেই ভেদাভেদ চলে গিয়ে প্রকৃত শান্তি দেশে ফিরে আসে বা আসতে পারে এবং স্বাধীনতার ভিত্তিও দৃঢ় ও সুদূর প্রসারী হয় বা হতে পারে।

মন্দির প্রবেশ ও পাঁতি-পত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, চক্‌মকি পাথর হাজার বছর জলে ভেজান থাকলেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মারা মাত্রই আগুন বের হবে। ভারতবর্ষে হাজার হাজার বর্ষ ধরে ছিল অস্পৃশ্যতা, অনিয়ম এবং শাস্ত্রের নামে ভণ্ডামি, কিন্তু রামকৃষ্ণের এক ধাক্কায় ঐ সব ভেঙ্গেচুরে সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেল। আজ আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দোষ দেখা যায় না। পাঁতিপত্র দেওয়ার যে রেওয়াজ ছিল কিছুদিন পূর্বেও, সে পাঁতিপত্র এখন আর কেউ গ্রহণ করবার জন্য অস্থির হয় না।

পূর্বে নিম্নজাতের কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ করলে অমনি হোত তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা, হোত তার ধোপা নাপিত বন্ধ, হাট বাজার থাকত রুদ্ধ, এবং একঘরে থাকতে হোত তাকে দীর্ঘকাল, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায় কাজ না করেও নিম্নজাতের লোকেদের কঠোর সাজা পেতে হোত যদি কোন উচ্চজাতের ব্যক্তি হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তার নামে সমাজপতির নিকট নালিশ করতো। প্রতিবাদ করবার সাধ্য ও সাহস তাদের ছিল না, তারা এরূপ সাজাকে মনে করতো বিধির বিধান। যার জন্য বিবেকানন্দ বলতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দল ভারতের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সমাজে একটা কুসংস্কারের শক্ত বেড়া সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছে।

সামাজিক কুশাসনই অদ্বৈত মহাপ্রভুর দশম পুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্ম হবার অন্যতম কারণ। তৎকালীন সমাজপতিদের মমত্ব-বোধের অভাব, সমাজপতিদের অবিচার এবং নিম্নজাতের লোকদের প্রতি অত্যাচার ও নিস্পেষণ প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। রংপুরের গোয়ালা শিষ্য চন্নোকে তাঁর অপর গোস্বামী ভাইয়েরা এক

হতভাগিনী নিরন্ন বিধবাকে সৎকার করবার অপরাধে—পাঁতি দিয়ে তার ধোপা, নাপিত, হাট-বাজার বন্ধ করে মোটা টাকা জরিমানা করে, একঘরে করে রেখে দেওয়ার সংবাদে তিনি মর্মাহত হয়ে বললেন, এক অনাথিনীকে সৎকার করায় যদি চন্নোর পাপ হয়ে থাকে তবে দুনিয়ার সকলেই পাপী।

তিনি তৎক্ষণাৎ এই সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে চন্নোকে গ্রহণ করে নিলেন এবং অপর শিষ্যদের বললেন, তোমরা কি মানুষ নও ? তোমরা কি চিরটা কাল মূক হয়ে সমাজের এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করবে ? জেনে রেখ, যে প্রকৃত ভালবাসতে পারে না তার শাসন করবার অধিকারও নেই। প্রকৃত শাস্ত্র কিন্তু এত নির্মম নয়। মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি থাকবে, তাই বলে আমি অন্যায় করলে আমার কোন সাজা হবে না কিন্তু চন্নো কোন অপরাধ না করেও তাকে পেতে হবে সাজা, এ বিধি ও বিধান চলতে পারে না।

এর কিছুকাল পরেই বিজয় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে দীর্ঘদিন ব্রাহ্ম-প্রচারকের কাজ করে প্রকৃত শান্তির পথ না পেয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে রামকৃষ্ণের মুখে কথামৃত শুনে প্রকৃত শান্তির পথ পেলেন এবং পরবর্তীকালে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে দীক্ষা গ্রহণ করে ও কাশীধামে সন্ন্যাস নিয়ে হিন্দু সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হয়ে সর্বধর্মের ও সর্বস্তরের মানুষের ঈশ্বর আরাধনায় অধিকার আছে—ব্যক্ত করলেন। সদ্‌গুরুরূপে সর্বজাতের লোকদেরই তিনি দীক্ষা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রামকৃষ্ণের চক্‌মকি পাথরের ছিটে-ফোঁটা আঁচ যাঁর গায়ে লেগেছে তিনিই শক্তিমান পুরুষে রূপায়িত হয়েছেন। রামকৃষ্ণের শক্তির সামান্য ছোঁয়ায় গিরিশ, নাগমহাশয়, শ্রীম অর্থাৎ মাষ্টার মশায় প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত সাধনায় অতি উন্নত হয়েছিলেন আর তৈরী হয়েছিল তেজোদীপ্ত বীর সন্ন্যাসীবাহিনী, যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং নরেন দত্ত। কেবল কি তাই, তাঁর চক্‌মকি

পাথরের আঁচের ছোঁয়া পাবার জন্য বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবৃন্দ একে একে উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের পদতলে।

রামকৃষ্ণ ও তস্য সন্তান বিবেকানন্দের পুণ্যপরশে সামাজিক বন্ধনগুলি এখন্ অনেক আলগা হয়েছে, যার জন্য আজ আর কেউ পাঁতিপত্র গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত হয় না, বরং পাঁতিপত্রগ্রহণ প্রথা এখন লুপ্ত।

রাসমণির রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূজারী আছাড় খেয়ে গোবিন্দের পা ভেঙ্গে দিলেন। রাসমণির চিন্তার অন্ত নাই, কি হবে! এ যে বড় অশুভ লক্ষণ, মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পা ভেঙ্গে গেল? আহা! এখন উপায় কি হবে? ডাকা হোল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সভা, উপস্থিত হলেন পণ্ডিতমণ্ডলী। তাঁরা পুঁথি ঘেঁটে পাঁতি দিলেন, ভাঙ্গা বিগ্রহকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাই হোল শাস্ত্রের বিধি ও বিধান্।

রাসমণির এই পাঁতি মনঃপুত হোল না, কারণ তাঁর অন্তরে শান্তি এল না কেন? তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছেন হাহাকার ধ্বনি। নির্জনে কাঁদতে লাগলেন রাসমণি। তখন প্রশ্ন জাগরিত হচ্ছে তাঁর মনে—তবে কি ঠাকুরটি সত্যি সত্যি পাথর ও তামা পেতলের দ্রব্য যে, তাঁকে গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে? রাণী ভয়ানক অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পড়লেন। মথুরবাবু বুঝলেন রাণীর চঞ্চলতার কারণ, তাই তিনি যিনি অবস্থাকে সরল ও তরল করতে পারবেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। ছোট ভটচায অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতদের পাঁতির কথা শুনেই বলে উঠলেন, যেমন তোমার পণ্ডিত তেমন তাঁদের পাঁতি ও ব্যবস্থা; ওরা তো দর্কচা-পড়া। না এদিক না ওদিক। রাণীর জামাই মথুরের ঠ্যাং ভাঙ্গলে পর রাণী কি জামাইকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে নতুন জামাইয়ের ব্যবস্থা করবেন? না, তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? ঠাকুরের ভাঙ্গা পা জোড়া দিয়ে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করাই হোল বিধান। যিনি

জগৎপিতা, যিনি সর্বজীবে, সর্বভূতে ও অণুপরমাণুর মধ্যে বিরাজমান তাঁর আবার ঠ্যাং ভাঙ্গা আস্তো কি ? পণ্ডিতমণ্ডলী শাস্ত্র পড়েন তর্ক করবার জন্য ও বিদ্যা জাহির করবার জন্য, ভগবানকে পাবার জন্য নয়। চৈতন্য যদি একবার উদয় হয় আর যদি ভগবানকে একবার পাওয়া যায় তখন আর হাব্‌জা গোব্‌জা বিষয় জানবার প্রবৃত্তি আসে না। গদাধরের সহজ ব্যবস্থাপনায় রাণীর চোখের জল চলে গিয়ে ফিরে এল শান্তি ও আনন্দাশ্রু।

গদাধরের ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে গড়া 'পা-ভাঙ্গা বিগ্রহ' পূর্বের ন্যায় নিখুঁত হয়ে রাণীর মন্দির আলো করে সকলের ভক্তি ও পূজা অর্জন করতে লাগলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণা রামকৃষ্ণের সহজ ব্যবস্থাপনায় গেল ভেস্তে। পণ্ডিতমণ্ডলীও রামকৃষ্ণের এই ব্যবস্থাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলেন না বা উপেক্ষা করবার সাহসও তাঁদের হল না, কারণ রামকৃষ্ণ যে আজ সকলের প্রাণের কথা বলেছেন।

আজ থেকে ১১৩ বৎসর পূর্বে (১২৫৫ বাং) রাণী রাসমণি কাশী বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য বহু লোকজন, অঢেল টাকা, থরে থরে দ্রব্যভাণ্ডার দ্বারা প্রায় শত খানেক নৌকা বোঝাই করে কাশী রওনা হলেন। নৌকার বহর ছেড়ে দিয়েছে। রাণী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখলেন, দেবী ভবতারিণী যেন তাঁকে প্রত্যাদেশে বলছেন— "কাশী যাবার প্রয়োজন নেই।" ভাগীরথীর তীরে আমাকে অর্থাৎ ভবতারিণীকে প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা কর। রাণী ধড়মড়িয়ে উঠে প্রত্যাদেশের কথা সকলকে বলে ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। রাণীর সঙ্কল্পের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমাজ-পতিরা ভাবছেন—কী সাংঘাতিক কথা, রাসমণি "রাণী" হলে কি হবে তিনি তো শূদ্রাণী ছাড়া কিছুই নন! রাসমণি, তুমি মন্দির মঠ প্রতিষ্ঠা করতে পার, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কাঙালী ভোজন করাতে পার, দানছত্র খুলতে পার, কিন্তু তোমার প্রতিষ্ঠিত দেবতার সম্মুখে অন্নভোগের ব্যবস্থা হতে পারে না—এ যে অসম্ভব।

তবে ভক্তের কাছে অসম্ভব কিছু নেই, সব 'অসম্ভবই' নিমিষে সম্ভব হয়ে যায় মায়ের কৃপা হলে—আর তাই হলো।

ভাগীরথীর পূর্বকূলে একসঙ্গে ষাট বিঘে জমি কেনা হ'ল মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। রাসমণি দীর্ঘদিন কঠোর সংযম নিষ্ঠা পালন করে তদারক তাগাদা দিয়ে, ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মন্দির ও বিগ্রহাদি নির্মাণ করালেন, এ যেন দ্বিতীয় মা অন্নপূর্ণার মন্দির। ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ, স্নানযাত্রার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হোল। রূপোর সহস্রদল পদ্মের উপর দক্ষিণ শিয়রে শবীভূত শিব শুয়ে আছেন, তাঁরই বক্ষের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন মা ভবতারিণী। তিনি নানা অলঙ্কার শোভিতা, কটিদেশে সারি সারি খণ্ডিত নরকর, গলায় সোনার মুণ্ডমালা, মাথায় মুকুট ও পরিধানে লাল বেনারসী শাড়ী, দেবী চতুর্ভুজা, দুই বাম হস্তে নৃমুণ্ড ও খড়্গ, আর দক্ষিণ করকমলে বর ও অভয় মুদ্রা, কী অপরূপ মনোরম মূর্তি; মৃন্ময়ী মা যেন চিন্ময়ী মূর্তি ধারণ করে দিক্‌মণ্ডল আলোকিত করে রয়েছেন।

মনের আনন্দে রাসমণি আরও সম্পত্তি ক্রয় করলেন মায়ের পূজা অর্চনা ভোগাদির জন্য! কিন্তু কৈ! রাসমণির মনে তো একটুও শান্তি নেই অথচ থরে থরে ফলমূল মিষ্টান্নাদি সাজান রয়েছে মায়ের ভোগের জন্য। রাসমণি চাচ্ছেন অন্নভোগ দিতে অথচ পণ্ডিতমণ্ডলী পুঁথিপত্র ঘেটে বলেছেন, শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অন্নভোগের ব্যবস্থা অসম্ভব ও অশাস্ত্রীয়। রাণী অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন; শূদ্রানী ব'লে কি তিনি মায়ের সন্তান নন? শূদ্রানী বলে কি মায়ের প্রত্যাদেশ বিফলে যাবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে?

নূতন উৎসাহে রাণী দিকে দিকে আবার পণ্ডিতদের পাঁতি পাবার জন্য লোক পাঠালেন কিন্তু তাঁদের নিকট থেকে এই কথাই পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হোল—শূদ্রানী দেবতাকে অন্নভোগ দেবার অধিকারিণী নন।

রাণীর অন্তরে কেবল ধ্বনিত হচ্ছে, নীচকুলে জন্মালেই তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা, পূজা-অর্চনা, জপ তপ কি তবে মিথ্যা। শ্রদ্ধাভক্তির কি কোন মূল্য নেই মায়ের কাছে ?

রাণীর চোখের জলে মায়ের কৃপা হোল। পণ্ডিত রামকুমারের ব্যবস্থাপনায় রাণীর সব দুঃখ গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল। ভবতারিণীর বিশাল সম্পত্তি রাণী 'গুরুর নামে' দানপত্তর করলেন, পণ্ডিতমণ্ডলী যদিও প্রীত হলেন না কিন্তু রামকুমারের পাঁতিকে নস্যাৎ করবার সাহসও কারোর হোল না।

সবই তো হোল কিন্তু মায়ের ভোগ পূজার জন্য সৎব্রাহ্মণ পূজারী কোথা পাওয়া যায় ? রাসমণি মন্দিরে পূজা করবার জন্য যাকেই ডাকেন তিনিই মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। কেউ কেউ আবার কড়া কথায় বলেন, শূদ্রের বাড়ী পূজা করা তো দূরের কথা, শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত দেবতার চরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রণাম পর্যন্ত করতে পারবেন না ; ব্রাহ্মণ পারবেন না ব্রাত্য হতে।

রাণী তো ভেবে কেঁদে অস্থির, এত চেষ্টা করেও ভোগ-পূজার ব্যবস্থা করা গেল না। তবে অভয়া যাকে অভয় দেন তার তো কোন ভয় থাক্‌তে পারে না, নিশ্চয় সুদিন আসবে এবং রাসমণির চোখের জলের বন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর দর্প ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে। আসবে সুদিন ও প্রকৃত শান্তির ধারা। মায়ের কাছে উঁচু নীচু জাতের মাপকাঠি নেই, যে মাকে প্রাণভরে ডাকবে সেই মায়ের আপনজন হয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারবে। ভক্তের অশ্রু বিফলে যায় না। এসেছেন পণ্ডিত রামকুমার, সঙ্গে এসেছেন ছোট ভটচায—স্বয়ং গদাধর। মায়ের অন্নভোগের ও পূজার কোন খুঁত ত্রুটি নেই। আজ রাণী মায়ের প্রত্যাদেশের প্রকৃত ব্যবস্থা করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা।

এমন যে ভক্তিমতী, মাতৃঅন্তপ্রাণ রাসমণি—তাঁকেও চপেটাঘাত খেতে হয়েছিল গদাধরের কাছে, যখন তিনি মায়ের মন্দিরে বসে বিষয়-

চিন্তা করছিলেন। রামকৃষ্ণ বলেন, মায়ের সাধনায় ডুবে থাকতে হবে, তখন ভুলতে হবে সংসার, বিষয়-সম্পত্তি ও আত্মজনের কথা, তবেই না মায়ের কৃপা হবে। মুক্ত হলেন রাসমণি, প্রকৃত জ্ঞান এল তাঁর। পরা-বিদ্যার প্রভাবে সংসারে থেকেও হলেন তিনি মোহমুক্ত।

রাণী রাসমণিকে কত রূঢ় বাক্য সহ্য করতে হয়েছিল, সহ্য করতে হয়েছিল অপমান এবং তাচ্ছিল্য—যা বিংশ শতকের শেষার্ধের লোক কল্পনাও করতে পারে না। কত অশ্রু তাঁর ঝরেছিল মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর যা ভাষায় বা কথায় ব্যক্ত করা যায় না—আর আজ? কেবল বাঙলার পণ্ডিতমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর আসছেন না, আসছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বিদ্বান মূর্খ, উচ্চ নীচ থেকে সকলেই। আজ আর কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাচ্ছিল্য করে বলতে সাহস পাচ্ছেন না যে, 'শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করা তো দূরের কথা—মাথা নোয়াব না শূদ্রানী প্রতিষ্ঠিত দেবতার পায়ে।' আজ গোঁড়া ব্রাহ্মণ থেকে তথাকথিত শূদ্র একসঙ্গে একাকার হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছেন মা ভবতারিণীর পায়ের তলায়। কেবল কি তাই—আজ আর সাহা, শুঁড়ি, তেলী, তামলী, মালী, তাঁতি এবং অপরাপর শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা অর্চনা করতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পাঁতিপত্র ও বিধিনিষেধের বালাই নেই। সবই আজ সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেছে। নিম্নজাতের লোকের প্রতি অত্যাচার দেখেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এস হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে॥

দেশে শুভদিন এসেছে। রামকৃষ্ণ তাঁর পরশমণির ছোঁয়ায় বিবেকানন্দকে সর্বসাধনায় সিদ্ধ করে দেশের কোটি কোটি মানুষ ভাইদের শিবজ্ঞানে সেবা নয়—পূজা করবা জন্য আত্মনিয়োগ করবার মন্ত্র কানে দিলেন, তাই বিবেকানন্দ বলতে পারলেন :

বহুরূপে সন্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥

প্রকৃতপক্ষে যদি ঈশ্বরের সেবা করতে হয় তবে নরনারায়ণের সেবা, পূজা করা প্রয়োজন। জীবে প্রেম বিলাতে পারলেই ঈশ্বর-সেবা হয়ে যায়, ঈশ্বর লাভ করতে হলে বা তাঁর কৃপা পেতে হলে, সত্যকে ধরে থাকতে হবে। সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। সেই সত্যরক্ষাকল্পে ঠাকুর ফুল হাতে করে বলেছিলেন—মা, এই নাও তোমার পাপ, পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি প্রভৃতি। আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। ঠাকুর মাকে সব অর্পণ করলেন কিন্তু সত্য অর্পণ করতে পারলেন না। কারণ সত্যই কলির তপস্যা। জীবে প্রেম ও সত্য কথা বলতে পারলেই মহামানবের সাগরতীরে মায়ের প্রকৃত অভিষেক হতে পারে। মায়ের প্রকৃত অভিষেক করতে পাঁতি-পত্রের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় প্রেম, ভালবাসা ও মৈত্রীর এবং সত্যকে আঁট করে ধরে থাকার।

লোকশিক্ষা ও নারীজাগরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর পণ্ডিতকে বললেন, বিচারবুদ্ধি তাঁরও পুরামাত্রায় ছিল বৈ কি? কিন্তু মায়ের কাছে প্রার্থনা করে তিনি বলতেন, "তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর বজ্রাঘাত করতে"। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, কুল-শীল-মান, জাতি আর অভিমান এই আটটা হচ্ছে অষ্টপাশ। মহাশক্তির কৃপা পেতে হলে পাশমুক্ত হতে হয়, অহংএর আঁশটি থাকলে মা মুখ ফিরিয়ে চলে যান। তাই রামকৃষ্ণের কথা—"বিচারবুদ্ধির উপর বজ্রাঘাত কর মা।"

১২৬২ বঙ্গাব্দে রাণী রাসমণি যখন তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবতার নিত্য পূজা ভোগাদির জন্য সৎ ব্রাহ্মণ পাচ্ছিলেন না, তখন পণ্ডিত রামকুমার রাসমণির মন্দিরে পূজার ভার নিলেন। এসেছেন রামকুমার মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, ছোট ভট্‌চায গদাধরও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। বিরাট উৎসব। লোকজনের অসম্ভব ভীড়, কেবল দাও আর খাও আর ধরো। অন্নছত্রের অপূর্ব ব্যবস্থা দেখে গদাধর ভাবলেন, মা ভগবতী বুঝি কৈলাস ছেড়ে এখানে রাণীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এত আয়োজন, এত সমারোহ, এত অন্নের ব্যবস্থা, এত দিয়তাং ভুজ্যতাম্ কিন্তু গদাধর ওখানে অন্নগ্রহণ তো করলেনই না, এমন কি প্রসাদ পর্যন্ত নিলেন না। বাজার থেকে মুড়ি কিনে এনে তাই খেয়ে দিন কাটালেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলেন রামকুমার। উত্তর এলো, কৈবর্তের মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ অসম্ভব! অথচ এই গদাধরই বাল্যে উপবীত গ্রহণের সময় শূদ্রানী ধনী কামারনীর হাতের প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য কত কাণ্ডই না করেছিলেন! এই গদাধরই চিনু শাঁখারিব পায়ের তলায় পড়ে বলেছিলেন, একবার তোরা হরি বল, হরি বল ভাইরে! আর আজ একি কথা শুনছেন রামকুমার গদাধরের মুখে। তিনি ভাবলেন, হয়তো গদাধরের পাণ্ডিত্য বেড়েছে।

শ্রীশ্রীমা

ঐ দিনই গদাধর ঝামাপুকুর চলে এলেন। সাত দিনের মধ্যেও যখন রামকুমার ঝামাপুকুর এলেন না তখন গদাধর দক্ষিণেশ্বর হাজির হয়ে শুনলেন—রামকুমার স্থায়ীভাবেই রাণীর মন্দিরে পূজা করবেন। আরম্ভ হল তুই ভাইয়ের মধ্যে তর্ক। গদাধরের কথা—"বংশ প্রথা শূদ্রযাজী না হওয়া।" রামকুমার অগ্রাহ্য করতে পারলেন না গদাধরের যুক্তি তত্রাচ সম্মিলিত অভিমতে 'ধর্মপত্র বা দেবা-দেশের' ব্যবস্থা করা হোল। জয়ী হলেন রামকুমার। গদাধর কিন্তু মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ করলেন না, এমন কি মন্দিরপ্রাঙ্গণে রান্না করেও অন্ন গ্রহণ করলেন না। মন্দির এলাকার বাইরে গঙ্গাতীরে গঙ্গা জলে ভাতে ভাত সিদ্ধ করে আহার করে খাচ্ছেন, এমন কি শিব পূজাও গঙ্গাতীরে বসে করছেন গদাধর। পরে অবশ্য মথুরের আগ্রহে তিনি মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যই তিনি বলতেন, আমার বিচার-বুদ্ধির উপর বজ্রাঘাত হোক।

এই রামকৃষ্ণই আবার বলতেন, বলরামের অন্ন শুদ্ধান্ন! এমন কি তথায় তিনি অন্ন গ্রহণও করেছেন, কেশবের বাড়ী চচ্চড়ি খেতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁর নিজের খোলো হুঁকোটিতে নরেনকে তামাক খেতে দিতেও কার্পণ্য করেন নাই, অথচ নরেন শিশুবেলা থেকেই পিতা বিশ্বনাথের বৈঠকখানায় বিভিন্ন জাতের লোকদের জন্য বিভিন্ন চিহ্ন-দেওয়া হুঁকো দেখে এসেছেন এবং শিশুবেলা মুসল-মানের জন্য রক্ষিত হুঁকোয় ২।১টা টানও দিয়েছিলেন। সেই নরেন দত্ত রামকৃষ্ণের নিজের হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন আর খাওয়াচ্ছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। এ একটি বিচিত্র ব্যাপার ছিল তখনকার দিনে।

কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বললেন রামকৃষ্ণকে, নরেন হোটেলে খায়, ব্রাহ্ম মন্দিরে যায়, এহেন লোকের এঁটো খাওয়া ঠাকুরের অন্যায়।

রামকৃষ্ণ বললেন, ওরে শালা ! তোদের কিরে ? নরেন হোটেলে খাক্ কি না খাক্ তোদের কি ?—তোরা যদি হবিষ্যি করেও খাস আর নরেন যদি হোটেলেও খেয়ে যায় তা হলেও তোরা নরেনের সমান নস্। নরেন রামকৃষ্ণকে গালাগালি দেয়, মুখ্খু বলে কিন্তু নরেন রামকৃষ্ণের প্রবল শক্তিকে করে ভক্তি শ্রদ্ধা ও পূজা—যার জন্য নরেন চিরকাল ছিল অজেয়।

ঠাকুর বলতেন, কেন এই নিষ্ঠার কাঠিন্য ছিল জান ? পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে পর অন্য আর একটি কাঁটা দিয়ে তুলে ফেলতে হয়, তারপর দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয় অর্থাৎ অজ্ঞান কাঁটাটিকে ফেলবার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান-কাঁটার, এরূপ জ্ঞান অজ্ঞান দুটো কাঁটাই ফেলে দিয়ে গ্রহণ করতে হয় বিজ্ঞান কাঁটা ; বিজ্ঞান অবস্থা এলেই আসবে ত্রিগুণাতীত অবস্থা। নিষ্ঠার প্রয়োজন ঠিকই আছে। সত্যে পৌঁছতে নিষ্ঠার প্রয়োজন। আগে কঠিন হও তবে তো সরল হবে। তাই তিনি বিশ্বমৈত্রী স্থাপন মানসে সামাজিক জঞ্জাল অপসারণের জন্য প্রথমে কঠিন হয়ে রাসমণির মন্দিরের চৌহদ্দীর মধ্যেও রান্না করে খেতেন না,—তারপর মথুরের নির্ভরতা ও একাগ্রতা দেখে তিনি সরল হয়ে জ্ঞান অজ্ঞান কাঁটা, মান মোহ মর্যাদা ফেলে দিয়ে বিজ্ঞান কাঁটা আহরণ করে পেলেন ত্রিগুণাতীত অবস্থা। রামকৃষ্ণ পোশাক, পৈতে ও উপাধিকে বলেন ছেলের হাতের চুষিকাঠি। শিশু যতক্ষণ চুষি চুষে ততক্ষণ মা কোলে নেয় না তাকে কিন্তু যখনই শিশু ত্রাহি ত্রাহি করে কেঁদে উঠবে তখনই মা ছুটে এসে সন্তানকে কোলে টেনে নিয়ে স্তন্য দান করবেন। সরলতা আকুলতা, ও ব্যাকুলতা না হলে মায়ের কৃপা হয় না।

রামকৃষ্ণ নরেনকে এত ভালবাসেন কেন ? দেশে তো আরও কত লোক আছে ? দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে আরও তো কত জ্ঞানী গুণী, শূর সূরী যাচ্ছেন কিন্তু রামকৃষ্ণের এত আকর্ষণ ঐ ডেঁপো ছোঁড়ার উপর কেন ? অথচ নরেন রামকৃষ্ণকে কি কম অপমান

করেছে? গঞ্জনা কি কম পেয়েছেন রামকৃষ্ণ নরেনের কাছ থেকে? নরেন রামকৃষ্ণকে কি কম পরীক্ষা করেছে? তবুও রামকৃষ্ণ নরেন বলতে এত অজ্ঞান অস্থির কেন? কেন রামকৃষ্ণের এই পক্ষপাতিত্ব নরেনের প্রতি? নরেন আলুথালু ভাবে এল দক্ষিণেশ্বরে, মা-ভাই-বোনেরা খেতে পায় না, আজ তার অর্থের ব্যবস্থা করতেই হবে। চাই তার প্রচুর অর্থ। রামকৃষ্ণকে নরেন বললে, দাও আমার একটা ব্যবস্থা করে তোমার মাকে বলে।

নরেনকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে মার কাছে বর চাইতে বললেন ঠাকুর। আজ নরেন যা চাইবে তাই পাবে। ইন্দ্রের স্বর্গ ও ঐশ্বর্য পাওয়া তার পক্ষে শক্ত নয়! কিন্তু নরেন কি চাইল? ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব? না! তবে কি চাইল? জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। লজ্জায় নরেন মায়ের কাছে চাইতে পারল না সোনা, দানা, মণি, মুক্তা বা ঐশ্বর্য। এরপরই তার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণ। শিব জ্ঞানে জীবকে সেবা ও পূজা করবার মন্ত্র দিলেন কানে। রামকৃষ্ণ বললেন—জীবকে কেবল জীব-জ্ঞানে সেবা করবে না, শিবজ্ঞানে পূজা করবে, সে পূজা ভালবাসার, সে পূজা দুঃখ ও কলঙ্ক মোচনের পূজা; সে পূজায় হবে অপমান ও অবহেলার উচ্ছেদ। এইগুলি আয়ত্ত করতে পারলেই রাষ্ট্রে ফিরে আসবে নূতন জীবন বেদ এবং দেশ হবে নবতর সাম্যবাদসম্পন্ন দেশ। শুধু পংক্তি সমান নয় পাত্র সমান, শুধু ভোগের বস্তু সমান নয় ভোগ করার ক্ষমতা সমান, শুধু পরিবেশনে সমান নয় আস্বাদনেও সমান হলে তবে হবে প্রকৃত সাম্যবাদী-সম্পন্ন দেশ। চাই অর্জুনের মত পুরুষকার আর রোক। খুব রোক না থাকলে মহৎ হওয়া যায় না। নরেনের অসম্ভব রোক ছিল, আর ছিল গুরুর উপর বর্ণনাতীত বিশ্বাস। গুরুর আদেশ মেনেছিলেন বেদ-বাক্যের মত। তাই না নরেন একক অর্জুনের ন্যায় পৃথিবী জয় করতে পেরেছিলেন। অত্যন্ত রোক ছিল বলেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যখন ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, মুখে তো খুব অবতার অবতার করছ—

রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত পুঁজরক্তমেশান সুজির পায়েস কেউ খেতে পার ? হাঁ পারে—যিনি গুরুঅন্তপ্রাণ, তেজস্বী বীর, যিনি একাধারে জাগ্রত বহ্নি আর তুহিন তুষার, যিনি পারেন জ্বালিয়ে দিতে, পুড়িয়ে দিতে, গলিয়ে দিতে, তলিয়ে দিতে, যাঁর একসঙ্গে আছে সূর্যের দীপ্তি ও চন্দ্রের শৈত্য, সেই নরেনই পারেন এক চুমুকে খেয়ে ফেলতে গুরুর পুঁজরক্তমেশান সুজির পায়েস। খেয়েও ফেললো নরেন এক চুমুকে সুজীর পায়েস। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, যিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম, ডি, ভারতীয় মেডিকেল এ্যাসোসিয়েসনের আজীবন সভ্য ও সহকারী সভাপতি, যিনি সত্যের জন্য ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এলো-প্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলীর নির্যাতন অত্যাচার ও অপমান সহ্য করেও লুক্কায়িত সত্য হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের মধ্যে আছে জেনে এলো-প্যাথির মানমর্যাদা ছেড়ে আজীবন হোমিওপ্যাথির সেবায় আত্ম নিয়োগ করেছেন, যিনি এশিয়ার হ্যানিমান বলে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন, সেই মহেন্দ্রলাল সরকার বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন, হলেন মূক নরেনের গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে। তাই রামকৃষ্ণ বলেন— আমি নরেনকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি আর আমি নরেনের অনুগত।

এই নরেনই একদিন পিতা বিশ্বনাথ দত্তকে বলেছিলেন, তিনি একজন কোচোয়ান হবেন। নরেন 'বিবেকানন্দ রূপ কোচোয়ান' হয়ে এই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন দেশটাকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন রাজসিক কর্মৈশ্বর্যে। সত্ত্বগুণের ধূয়া ধরে যখন দেশটা নেমে যাচ্ছিল তমোময় মহাসমুদ্রে তখন নরেন 'বিবেকানন্দ কোচোয়ান' রূপে চাবুকের আঘাতে দেশটাকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন জগৎসভার মাঝে। যখন পরাবিদ্যার ছদ্মবেশ ধরে নিজেদের মূর্খতা ঢাকতে চাচ্ছিল কেউ কেউ, তখন গুরুঅন্তপ্রাণ বিবেকানন্দ চাবকে সেই অপরাবিদ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছেন, যখন ভণ্ডের দল তপস্যার ভান করে অবিবেক ও অবিচারকে ধর্মের ভেতর টেনে এনেছিল তখন তারা নরেনের

চাবুকের ভয়ে ভীতত্রস্ত হয়ে তাদের মুখোশ খুলে পালাল। গুরু রামকৃষ্ণের নির্দেশে কেবল নরেনই তমসার অবসান ঘটাবার জন্য হাতে নিয়েছিলেন চেতনার চাবুক, এবং মানুষকে শিবজ্ঞানে পূজা করবার জন্যই নরেন কোচোয়ান রূপে হাতে নিয়েছিলেন ভালবাসার বল্গা, তাই না দেশের পুঞ্জীভূত জঞ্জালগুলি আজ লুপ্ত হবার পথে। এজন্যই রামকৃষ্ণ বলতেন, নরেন আমার শুদ্ধভক্ত দামাল ছেলে, আর নরেন ছিল রামকৃষ্ণঅন্তপ্রাণ।

রামকৃষ্ণ কেশবকে বলছেন, জগদম্বার কৃপায় তুমি একটা শক্তি পেয়েছ—সেটা 'বক্তৃতা শক্তি', এতেই তুমি জগৎমান্য হয়েছ, আর আমার নরেনের ভেতর আছে আঠারোটা শক্তি। নরেন হোল খানদানি চাষা, বারো বছর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ ছাড়ে না; ও হোল খাপখোলা তরোয়াল আর রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই। আরগুলি সব পোনা, কাঠিবাটা। অন্যেরা কলসী, ঘটি আর নরেন্দ্র আমার জালা। তাই নরেনকে ঠাকুর এত ভালবাসতেন, এত তার জন্যে কাঁদতেন।

হাজার হাজার বছরের গাঢ় অন্ধকারের তমসাচ্ছন্ন দেশ একটি মাত্র দেশলাই-এর কাঠির আগুনে উজ্জ্বল হয়ে যায়, তাই তিনি শুকনো দেশলাই হতে বললেন। বিবেকানন্দরূপী নরেন হাজার বছরের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশার অবসান ঘটিয়েছিলেন দেশলাইয়ের আগুনে। অন্ধবিশ্বাস, ভণ্ডামী, কুসংস্কার, অচলায়তনের গণ্ডী, পাঁতিপত্রের শক্ত গাঁট সমস্তই সেই দেশলাইয়ের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; আজ আর কেউ ঐ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেবল কি তাই—যে মাতৃজাতির জঠর থেকে আমরা ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেছি, যে মায়ের স্তন্যসুধা পানে হয়েছে আমাদের শরীর গঠন, যে মায়ের স্নেহধারা বর্ষণে আমরা মানুষ হয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি, সেই মাতৃজাতি উনবিংশ-শতকে এমন কি বিংশ শতকের

প্রথম স্তবকেও (তাঁরা) ছিলেন নিছক জড়পিণ্ডের মত, সমাজপতিরাই তাঁদের বিচার করবার ছিলেন মালিক। একটু ভুলত্রুটি হলে আর রক্ষা ছিল না। সামান্য দোষ-ত্রুটির জন্য ২।১টি সন্তানের মাতাকেও সমাজচ্যুত করে দেওয়া হোত। মাতৃজাতির প্রতি হত কঠোর সাজার ব্যবস্থা। এর বিষময় ফল কি সাংঘাতিক ছিল যা প্রত্যেক দেশসেবক, সমাজসেবক বা আজিকার দিনের শিক্ষিত সমাজ জানেন। অন্যায় বুঝেও কেউ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পাঁতি-পত্রকে তাচ্ছিল্য করবার সাহস পেত না। মাতৃ-জাতির প্রতি অবিচারের মূলেও কুঠারাঘাত হানলেন রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ। আজ নির্ভয়ে মা বোনেরা দেবতা দর্শন করছেন, ট্রামে বাসে, রাস্তায় বেড়াচ্ছেন। আজ তাঁরা শিক্ষায়, দেশসেবায়, সমাজগঠনে পুরুষের পশ্চাতে বোঝাস্বরূপ নেই, আছেন তাঁরা সহকর্মিণী বা সহধর্মিণী রূপে। আজ আর একটু ছোঁয়া লাগলে বা কেউ কোন রমণীকে একটু কটাক্ষ করলে তার জাত চলে যায় না বা তাকে সমাজচ্যুত হতে হয় না, আজ তাঁরা সবদিক দিয়েই পুরুষের সহকারী।

একশ বছর পূর্বের অবস্থার সঙ্গে আজকার অবস্থার তুলনা করলে দেখা যায়—তখন নারীর স্থান কোথায় ছিল আর আজ তাঁদের স্থান কোথায়? শ্রীমা, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা ও গৌরীমা যেরূপভাবে নারী জাগরণের জন্য কঠোর ব্রত নিয়েছিলেন তা ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা হবে! এতো ছিল তখনকার দিনের সমাজপতিদের কাছে অলীক স্বপ্ন। কত জটলা, কত নিন্দা, কত পাঁতিপত্রের ব্যবস্থা হ'ত এর জন্য—যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না আজ। মেয়ের আট-দশ বৎসর বয়স হলেই মেয়ের বাপ মা অকূল-সমুদ্রের মধ্যে পড়তেন। বিয়ের ব্যবস্থা না হলেই জাত যাবার ও একঘরে হবার ভয়। আর আজ ২০।২৫।৩০ বছর পর্যন্ত মেয়েরা নির্ভাবনায় স্কুল কলেজে বিদ্যা অর্জন করে চাকুরী করছেন। শ্রীমা, গৌরীমা ও নিবেদিতা স্ত্রী-শিক্ষার মান উন্নত করবার জন্য এবং স্ত্রী-

জাতির মঙ্গল বিধানের জন্য অসাধ্য সাধন করেছেন। রামকৃষ্ণের কথায়, সম্মুখের দিকে এগিয়ে চল। একটু এগোলে চলবে না—রীতিমত ভাবে এগোতে হবে। চন্দনের গাছেই কাজ শেষ নয়—তামার খনি, রূপোর খনি, সোনার খনি, মণিমুক্তা জহরৎ লাভ করলে পর তবে এগোন শেষ হবে। সামান্য স্ত্রীশিক্ষা দিলেই চলবে না। উচ্চশিক্ষা দিতে হবে, নারীকে পুরুষের সমকক্ষ সর্বদিক দিয়ে করতে হবে, নারী যে শক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তির অংশ সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে। মাতৃজাতিই জাতির মেরুদণ্ড, তাইনা তিনি নিজে শ্রীমা (সারদামণি)-কে আদ্যাশক্তিজ্ঞানে ষোড়শ উপচারে পূজা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ দেখালেন—স্ত্রী সামান্যা নয়, তোমার ইহকাল, পরকাল, সাধন ভজনের তিনি সহায়ক। তিনি দেখিয়ে গেলেন, স্ত্রী ঠুনকো জিনিস নয় যে, সামান্যতেই তাকে বর্জন করতে হবে বা করা যায়। সমাজশাসন ও পাঁতিপত্রের বহু উর্ধ্বে স্ত্রী, সুতরাং তাঁর প্রাপ্য সম্মান তাঁকে দিতে হবে। এ যে সতী, সাবিত্রী, সীতা, গার্গী, খনা, মৈত্রেয়ীর দেশ। দেশে স্ত্রী-জাতিকে ঐ ভাবে গড়তে হবে, দিতে হবে তাদের সমান অধিকার যাতে ঘরে ঘরে খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, জন্মাতে পারে—সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে পারলেই হবে জাতির মঙ্গল। দেশে প্রকৃত মা প্রস্তুত না হলে দেশের মঙ্গল সুদূরপরাহত।

স্ত্রীশিক্ষা ও অবতারত্ব সমর্থন

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। সংসারের টুকিটাকি ব্যাপারেও তিনি ছিলেন পাকাপোক্ত। সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ সম্পর্কে বহু জ্ঞানী, গুণী, সাধু, সজ্জন বহুভাবে আলোচনা করেছেন কিন্তু সাধন-ভজনের ও সৎ-কথার সাথে সংসারের প্রতিটি ব্যাপারকে এমন সুন্দর রূপ দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন কয়জন?

রামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে (সারদামণিকে) বলেছেন, গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিষ নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।

কী চমৎকার উপদেশ! যদিও এ অতি পুরাতন কথা, তত্রাচ বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য এমন মধুর উপদেশ আর কে দিয়েছেন? গাড়ী, ষ্টীমার বা জাহাজ থেকে তাড়াহুড়া করেই নেমে থাকে বেশীর ভাগ লোক, যার ফলে জীবনহানি, দ্রব্যনাশ ও হয়রানি হওয়াই স্বাভাবিক। সারদামণিকে সর্ব-দিক দিয়ে উন্নত করবার জন্য বিবিধ প্রকারের উপদেশ দিতেন বলেই তিনি কাম ক্রোধ ও লোভকে জয় করতে পেরে-ছিলেন। মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণ রামকৃষ্ণকে দশ সহস্র মুদ্রা দিতে চাইলে রামকৃষ্ণ তাকে ধমক দেওয়ায় লছমীনারায়ণ অনুরোধ জানালেন---তবে শ্রীমার হাতে এই অর্থ প্রদান করবার অনুমতি প্রদান করলে তাঁর হাতে এই অর্থ দেওয়া যেতে পারে। সারদামণির আজ কঠোর পরীক্ষা, হৃদয় তো টাকাটা হাতছাড়া না হতে পারে তার জন্য ওকালতি করেই যাচ্ছে।

অনুমান, ঠাকুর পরীক্ষা করবার মানসে লছমীনারায়ণকে অনুমতি দিলেন, আচ্ছা, দিতে পার তোমার অর্থ সারদামণিকে।

দরিদ্র পল্লীবধূ, যাকে অর্থাভাবে বিপৎসঙ্কুল ২।৩ দিনের পথ পদব্রজে অতিক্রম করে দক্ষিণেশ্বর আসতে হত, পয়সা অভাবে যিনি পাল্‌কি পর্যন্ত ভাড়া করতে পারতেন না, সেই সারদামণি লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন মাড়োয়ারী ভক্ত লছমীনারায়ণের দশ সহস্র মুদ্রা। পরীক্ষায় জয়ী হলেন সারদামণি। তিনি বললেন, তোমাকে (ঠাকুরকে) লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে ত্যাগের জন্য, ঐ টাকা আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হবে।

ঐ টাকা কিছুতেই লওয়া হবে না। কত বড় ত্যাগের শিক্ষা থাকলে একজন দরিদ্র পল্লীবধূ দশ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন। ঠাকুর ত্যাগের মন্ত্র কেবল তাঁর সন্ন্যাসী-ভক্ত ও ত্যাগী-ভক্তদেরই দেন নাই, সারদামণিকেও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন বলেই মা আজ দশ হাজার টাকার মোহ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

সারদামণি বললেন, আমাকে তিনি কত রকমে শিক্ষা দিয়েছেন; প্রদীপে সলতেটি কি ভাবে রাখতে হবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক, কার সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, অপরের বাড়ী গিয়ে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, প্রভৃতি সংসারের সকল কথা থেকে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর শিক্ষা দিয়েছেন।

এরূপ উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছিলেন বলেই নিরক্ষর পল্লীবধূ সারদামণি তেলোভেলোর প্রান্তরে বাগ্‌দি ডাকাতকে সহজভাবে বলতে পেরেছিলেন, বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি···তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁর নিকট যাচ্ছি।

সারদামণির নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্টি কথায় বাগ্‌দি পাইক ও তার স্ত্রীর প্রাণ একেবারে গলে গেল। তারা সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলে সত্য সত্যই সারদামণিকে আপনাদের কন্যার ন্যায় দেখে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

রামকৃষ্ণের সহজ এবং সরল শিক্ষাপ্রভাবে তিনি সর্বদিক দিয়ে উন্নত হতে পেরেছিলেন বলেই ঠাকুরের কথা সুন্দর ভাবে স্ত্রী-ভক্তদের বলতে পেরেছিলেন। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন, তবে কি জান, সাধু পুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক একজন এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন, একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে ব'সে হরেক রকমের বোল বলছে, শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও, আমরা পাখীর বোল বলি।

স্ত্রী-ভক্তদের একজন মুক্তির কথা বলায় শ্রীমা এমন সরল অথচ নিপুণভাবে বললেন যা উচ্চস্তরের সাধকের পক্ষেও ঐরূপ সহজ-ভাবে ব্যক্ত করা ক্লেশকর। শ্রীমা বললেন, ওকি জান মা, ও ছেলের হাতের সন্দেশ, কেউ কত সাধাসাধি করছে একটু দে না, একটু দে না, তা কিছুতেই দেবে না, অথচ যাকে খুশি হল টপ্‌ করে তাকে দিয়ে ফেললে। একজন সারাজীবন মাথা খুড়ে কিছু করতে পারলেন না, আর একজন ঘরে বসে পেয়ে গেলেন, যেমনি কৃপা হল, অমনি তাকে দিয়ে দিল। কৃপা বড় কথা। ঠাকুর বলতেন—জরু, গরু, ধান এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান। এসব চারা গাছের সময় বেড়া না দিলে—ছাগলে মুড়োবে মাথা। ঠাকুরের প্রখর দৃষ্টি ছিল সর্বদিকে। আধার চাই, মা, নইলে হয় না, উপদেশ নেয় তেমন আধার কই?

নিবেদিতার ভক্তির কথা বলতে বলতে মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্রীমা নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, যে হয় সুপ্রাণী তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।

দুঃখ করে একজন স্ত্রীভক্ত বললেন, ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি (নিবেদিতা) এত অল্পদিনে চলে গেলেন।

বাংলার নারীজাগরণ ও স্ত্রীশিক্ষার মূলাধার হিসাবে বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-জাগ্রত হয়ে থাকবে।

ঠাকুরের শিক্ষার গুণেই শ্রীমা অত উঁচুতে উঠেছিলেন বলেই না তিনি বলতে পেরেছিলেন, আধার চাই, মা, নইলে হয় না। এর জন্যেই তিনি সেইকালে অব্রাহ্মণ স্ত্রীশিষ্যার হাতের রান্না খেতে আপত্তি তো করেনই নাই, অধিকন্তু নিজকন্যারূপে তাকে গ্রহণ করে বললেন, তা খাব না কেন, তুমি আমার মেয়ে। কেবল তাই নয় শ্রীমার ভাইঝি, নলিনীর একটু শুচিবাই ছিল। তিনিও তাঁর রান্না খেয়ে বলেছিলেন, আমার তো কারোর রান্না রোচে না কিন্তু এর হাতে খেতে তো ঘেন্না হচ্ছে না।

মা বললেন, কেন হবে ? ও যে আমার মেয়ে।

মেয়ে বা ভক্ত বা শিষ্যের কোন জাত নাই—এই শিক্ষা তিনি রীতিমত ভাবে পেয়েছিলেন বলেই তিনি শ্রীশ্রীমা হতে পেরেছিলেন। উপযুক্ত আধার ছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, মন্ত্রতন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। এই ভক্তিবলে বলীয়ান হয়েই তিনি ঠাকুরের ন্যায় সাধন-ভজন ও অপরাপর বিষয়গুলি সহজ ও সরল করে দিতে পারতেন।

শ্রীমা বলতেন, উচিত কথা গুরুকেও বলা যায়, তাতে পাপ হয় না, তবে গুরুভক্তি থাকা চাই ; গুরু যেমনই হোক তাঁর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি। ঠাকুরের শিষ্যভক্তদের কি ভক্তি দেখ দেখি, এই গুরুভক্তির জন্য ওরা গুরুবংশের সকলকে ভক্তি তো করেই, গুরুর দেশের বেড়ালটাকে পর্যন্ত মান্য করে।

স্ত্রীশিক্ষার দিকেও শ্রীমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ছিল। একজন

স্ত্রীভক্ত শ্রীমাকে বললেন, আমার পাঁচটি মেয়ে মা, বিয়ে দিতে পারি না, বড়ই ভাবনায় আছি।

শ্রীমা বললেন, বিয়ে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে। রামকৃষ্ণের উপযুক্ত আধার ছিলেন বলেই শ্রীমা রামকৃষ্ণের কথামৃত তদ্রূপেই বলতে পেরেছিলেন—আর হাজার হাজার শিষ্য-শিষ্যা তাঁর বাণী শুনবার জন্য ব্যাকুল হত।

রামকৃষ্ণ বলতেন,—সাধন আর কি? সহজ সাধন "সদা সত্য কথা বলিবে"। সত্য কথা বলা, এতো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্য প্রয়োজন নেই দৌড়-ঝাঁপের, উগ্র তপস্যার, এর জন্য প্রয়োজন হবে না শাস্ত্র পড়বার, প্রয়োজন হবে না যাগযজ্ঞ ও তীর্থ পর্যটনের, সহজ ভাবে সংসারে চলো ফেরো আর সত্য কথাটি আঁট করে ধরে থাক—কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ সব ঠিক ঠিক বলো। যারা বিষয়-কর্ম করে, অফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত।

কথার আচরণে সত্যকে ধীরে ধীরে আরোপ করতে পারলে দেখা যাবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হয়েছ তুমি, পাহাড় পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সত্যময় জীবন পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখে। তাই না ঠাকুর বলেছেন, মাকে সব দিলুম কিন্তু সত্য দিতে পারলুম না!

সত্যকথা সম্বন্ধে ঠাকুর সিঁদুরিয়া পটির মণি মল্লিকের বাড়ীর ব্রাহ্মসমাজে বসে যে আলোচনা করেছেন তা অতি মনোরম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছেন, হ্যাঁগা, শিবনাথ (শিবনাথ শাস্ত্রী) আসবে না? একজন ব্রাহ্ম ভক্ত বললেন—না, আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আসতে পারবেন না। রামকৃষ্ণ বললেন, শিবনাথকে দেখলে আমার খুব আনন্দ হয়, যেন ভক্তি-রসে ডুবে আছে, আর

যাকে অনেকে গণে মানে, তাতে নিশ্চয়ই কিছু ঈশ্বরের শক্তি আছে। তবে শিবনাথের বড় একটা দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবে কিন্তু যায় নাই আর কোন খবরও পাঠায় নাই, ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকেই আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সকল নষ্ট হয়ে যায়।—আমি এই ভেবে যদি কখনও বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, বাহ্যে যদি নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর, মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। যখন এই সকল বলছিলাম—তখন একথা বলতে পারিনি, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না।—এই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অপরাপর ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সত্যই সাহস, উদ্যম ও সত্যই পবিত্রতা। আমরা শিশুবেলা থেকে পড়ে এসেছি, এখনও শিশুরা পড়ে, ভবিষ্যতেও সকলে পড়বে, "সদা সত্য কথা বলিবে মিথ্যা কথা বড় পাপ"! কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করে কয়জন? তাই রামকৃষ্ণ বহুভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সত্য কথা বলার জন্য। সত্য বাক্য, নির্ভয়তা, দৃঢ়-প্রত্যয় ও সহনশীলতা থাকলে পর মানুষ ভগবানের কৃপা শীঘ্র শীঘ্র পেয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ গৃহী, সন্ন্যাসী, সাধু-সজ্জন সকলকেই সরল ভাবে উপদেশ প্রদান করতেন; উপদেশের ভাষা থাকত মধুর-রসে পরিপূর্ণ, ব্যাকরণের দাঁতভাঙ্গা শব্দগুলি রামকৃষ্ণের

উপদেশের মধ্যে স্থান পেত না বলেই বালক, কিশোর, যুবক থেকে সকলেই সমভাবে বুঝতে পারতেন তাঁর কথামৃত।

দৃঢ় প্রত্যয়ের কথায় রামকৃষ্ণ বলেন, দৃঢ় প্রত্যয় নরেনের খননাস্ত্র। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই খুঁড়ছে, হোক তা প্রস্তর-কঙ্করাকীর্ণ, সেখান থেকেই সে উদ্ধার করবে তৃষ্ণার পানীয়।

দৃঢ় প্রত্যয় থাকলে পর সে কাউকে ভয় করে না, সে আত্মোদ্ধার করবেই, করবেই সে আত্মোদ্ঘাটন।

দরদী ঠাকুর অসুস্থ, কাশীপুরের বাড়ীতে আছেন। কারোর কাছে আসতে বারণ, তাই যখন তখন কেউ আসতে পারে না ঠাকুরের কাছে। একদিন নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী এসেছে, রামকৃষ্ণ তাঁকে একটু একান্তে নিয়ে গিয়ে বলছেন, হ্যাঁগা, তোমায় একটা কথা বলব?

সঙ্কুচিত বৌ বলছে, আপনি বলবেন তাতে আবার কথা কি?

আমার এখানে একটা বেড়াল আছে, তার আবার কতগুলি বাচ্চা, কিন্তু জান এখানে মাছ নেই, দুধ নেই। বড় কষ্ট হবে তাদের, তুমি নিয়ে যাবে?

নবগোপালের স্ত্রী বললে, আপনার দান, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

—নেবে যে তোমাদের অসুবিধা হবে না তো? যদি কেউ মারে বেড়াল ছানাদের? তোমার বাড়ীর কর্তারা যদি অমত করে? যদি কেউ বিরক্ত হয়?

বৌ বলল, আমি বেড়াল খুব ভালবাসি।

নবগোপালও যখন সায় দিল তখন ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন। বিষয় যদিও সামান্য, একটা বিড়াল ও কয়েকটা বাচ্চা কিন্তু ঠাকুরের কী দরদ! আহা! এখানে দুধ নেই, মাছ নেই, বেচারাদের কষ্টের সীমা নেই, তাই তিনি বিড়াল ও বাচ্চাদের খাওয়া থাকার জন্য অপরের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছেন, জানাচ্ছেন আকুতি। এরা অবলা জীব, কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে, এই ঠাকুরের ভাবনা, অথচ নিজে শয্যাশায়ী

অবস্থায় আছেন। নিজের রোগযন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে বিড়াল পরিবারের কষ্টের কথাই মূর্ত হয়ে ফুটে উঠল তাঁর কথায়, তাঁর আচরণে। নবগোপালের স্ত্রীর সম্মতিতেও ঠাকুর নিশ্চিন্ত হতে পারেন নাই. যদি কেউ মারধর করে বাচ্চাদের তবে কি হবে? তাই মত নেওয়া হল নবগোপালের, যিনি পরবর্তী কালে 'জয়রামকৃষ্ণ' নামে ছিলেন খ্যাত। দরদী ঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন। বিড়ালগুলি উপযুক্ত স্থান পেয়ে গেল, ঠাকুর আনন্দিত ও প্রীত হলেন।

বলছেন ঠাকুর—অতশতয় দরকার কি? শুধু সরল হয়ে যাও। সরলের কাছে তিনি সহজ। কপট হয়েছ কি তিনি দূরে সরে গিয়েছেন—সেয়ানা বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি ও বিচার বুদ্ধি করতে গিয়েছ তো অমনি তিনি বেপাত্তা। বঙ্কিমকে বলছেন ঠাকুর, 'সরল ভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন, একবার দেখনা ডেকে। ছেলে যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়, মেঠাই সন্দেশে ভোলে না, কেবল মা মা করে, তেমনি করে একবার ডাকনা, দেখনা, মা তোমার কাছে ছুটে আসে কিনা?

কী আন্তরিকতা ঠাকুরের,—সরল হয়ে ডাক, শিশুর মত মা মা বলে ডাক, কাঁদ—মা মা বলে—মার কৃপা লাভ করতে পারবে। খুব করে বালকের সাথে মিশবে, নিজের মধ্যে বালকভাব আরোপ কর। যতক্ষণ বালকের সাথে মিশা যায় ততক্ষণ নিজেও বালক, নিজেও আত্মভোলা হবে। বালকের মতই হবে সরল বিশ্বাসী, শিখবে আখখুটেপনা, তবেই তো মায়ের কোল পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ঠাকুর চারিটি ভাবের কথা বলছেন, বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ এবং জড়বৎ অবস্থা হলে পর আসে পরমহংস অবস্থা, পরমহংস অবস্থা এলে মায়ের কৃপালাভ সহজ হয়।

এই বালক ঝগড়া করচে আবার বন্ধুত্ব পাতিয়ে খেলা করছে। এই মারামারি, টানাটানি, এই আবার বন্ধুভাব। এইরূপ বালকবৎ

অবস্থা যখনই হবে তখনই মায়ের কৃপালাভ সহজ হবে। পিশাচবৎ ভাব হলে পর গঙ্গাজলে নর্দমার জলে পার্থক্য থাকে না, পার্থক্য থাকে না চন্দন বিষ্ঠায়। অর্থাৎ চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান। উন্মাদবৎ অবস্থার কথায় ঠাকুর মনোরম উদাহরণ দিয়ে বলছেন, একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন, কারোর সহিত বাক্যালাপ করতেন না, লোকেরা তাঁকে পাগল বলে জানত। একদিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে, একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন ও কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। তাই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তাকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগল। এই দেখে সেই সাধু তাদের বলতে লাগলেন, তোমরা হাসছ কেন ?—

বিষ্ণুপরি-স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে! বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

ঠাকুর বিষ্ণুময় জগৎকে দেখতেন বলেই বিড়াল-বাচ্চাদের জন্য তাঁর কত দরদ ছিল, কত দরদ ছিল গিরিশ, দেবেন, প্রভৃতির জন্য। ঠাকুর বলতেন, পাপী পাপী বললে পাপীই হতে হয়। তাই না বিবেকানন্দ বলতে পেরেছিলেন, বেদবেদান্ত আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা তাঁর জীবনে তা করে গেছেন। এ যে কত বড় সত্য কথা তা যদি আমরা কয়েক যুগ পূর্বের ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে উপলব্ধি করতে পারব।

ব্যাধ-বালিকা অজ্ঞানতাবশতঃ আরতির সময় নারায়ণ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার অপরাধে গুরু দেবলের আদেশে হতভাগীনীকে তুষানলে দগ্ধ করার ব্যবস্থা হোল। শিষ্য অজামিল গুরুর পায়ে মাথা রেখে বললেন, জেনেশুনে বালিকা অপরাধ করেনি, ব্যাধ-বালিকার লোকালয়ের নিয়ম জানা নেই। সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা

করলো গুরুর কাছে। গুরু দেবল গর্জে উঠে বললেন, তুমি ভক্তিমান হয়েও অজ্ঞান, যে বিষয়ে তোমার অধিকার নাই সেই বিষয়ে হাত দিতে যেও না, ধর্মের সূক্ষ্ম-বিচার, সেখানে মায়া-মমতা বা আকুতি নেই। ক্ষমা করা অসম্ভব। তাতে অশুভ হবে।

অজামিল ভাবছেন, ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে তুষানলে পুড়িয়ে মারলে অশুভ হবে না? হোক সে চণ্ডাল, হোক সে ব্যাধ, ঐ ব্যাধ-বালিকা কি নারায়ণের সন্তান নয়? নারায়ণের সন্তান, নারায়ণের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার অপরাধে হবে মৃত্যুদণ্ড? ধর্মের নামে হবে পৈশাচিক কাণ্ড! এ অতি অদ্ভুত? এতে অশুভ হবে দেশের, অকল্যাণ হবে মানব সমাজের, সুতরাং এর প্রতিরোধ করতেই হবে। ব্যাধ-বালিকাটিকে অজামিল উদ্ধার করে নিজে নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মের নামে এরূপ নিম্নজাতের উপর চলতো অত্যাচার, তাই রামকৃষ্ণ সুন্দর উপমা দ্বারা দেখালেন কুকুরের উপর উপবিষ্ট হয়ে সাধক নিজেও খাচ্ছেন, কুকুরকেও খাওয়াছেন আর জনতাকে বলছেন, বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে, কথং হসসি রে বিষ্ণু সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

সেই যুগে অজামিল যে পরিবর্তন আনতে পারেন নাই রামকৃষ্ণ তাঁর জীবন-বেদের মাধ্যমে এই সামাজিক অত্যাচারের আমূল পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিকেও পেরিয়া জাতির উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনীর কথা সকলের নিকট পরিস্ফুট হয়ে আছে কিন্তু আজ আর তাদের উপর অত্যাচারের কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কেবল পেরিয়া জাতির উপরই নয়, কোন নিম্নজাতের উপর নাই অত্যাচার। রামকৃষ্ণ বিষ্ণুময় জগৎ দেখতেন বলেই তাঁর সরল ব্যবস্থাপনা ছিল—সকলেই বিষ্ণু অতএব সকলেরই সমান অধিকার আছে মায়ের পূজায়।

বিষ্ণুময় জগৎ ও বিষ্ণুময় প্রাণী এই ভাবটি এলে পর আর পায় কে? তখন নেংটা হতেও বাধে না আবার পরণের কাপড় মাথায়

বেঁধে চলাফেরা করতেও লজ্জা নাই। বিষ্ণুরূপী নর-দেবতার হাতের খাদ্য খেতেও লজ্জাবোধ হবে না। জড়বৎ হলে আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। গায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে গেলে বা মাথায় পাখী বসলেও তার চৈতন্য থাকে না—সমাধিস্থ অবস্থা হলেই এসকল অবস্থা হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই চারিটি ভাব বিদ্যমান ছিল বলেই তিনি পরমহংস হতে পেরেছিলেন ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধানে তিনি অবতার আখ্যা পেয়েছিলেন। এবং এই সকল ভাব ছিল বলেই তিনি বালক-দের সাথে মিশতে উপদেশ দিতেন, বাল-স্বভাব আয়ত্ত করার জন্য। ঠাকুরের মস্ত বড় কথা হল সরল হওয়া, ধরে থাকা, আর সেবা করা। সেবাই পূজা, সেবাই উপাসনা। প্রথম ভগবানের সেবা, তৎপর জগজ্জনের সেবা; জগজ্জনের সেবা দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে বলেই স্বামী অখণ্ডানন্দ সারগাছিতে সর্বস্তরের মানবের মনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। সারগাছি অঞ্চলের পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণেরা এবং মহুয়া প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণেরা এসে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই মহৎভাব তথাকার মানবের কি ভাবে এল? অখণ্ডা-নন্দ দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের সময় যেরূপ জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য প্রাণপণ সেবা করেছিলেন এ তারই ফল; যার জন্য বহরমপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীলেভিঞ্জ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার সংকল্প অনুমোদন করে-ছিলেন। সেই আশ্রম আজ কোন স্তরে এসে পৌঁছেছে তা কারো অজানা নাই। ঐ আশ্রম থেকে বিদ্যালয়, ছুতারের কারখানা, তাঁত-শালা, গোশালা থেকে আরম্ভ করে সমস্তই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অখণ্ডা-নন্দ তাঁর সেবাধর্মের দ্বারা অঘটন ঘটাতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণের চকমকি-পাথরের আগুনের ছোঁয়ায় কত মহৎ প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল এবং সম্ভব হয়েছিল এই দেশের বহু দিবসের অবিচার অনিয়মের অবসান।

বিবেকানন্দ বলেন, যে তাঁর পূজা করবে সে নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে (মেয়ে বা পুরুষ)। "শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব"— তিনি মেয়ে সেজে থাকতেন, তিনি যেন আমাদের মা। ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলান আর জাতি জাতি করে গরীবদের পিসে ফেলা। তিনি (রামকৃষ্ণ) স্ত্রীজাতির উদ্ধারকর্তা, ইতর সাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা। He was the saviour of women, saviour of the masses, saviour of the high and low. ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজায় সকলের অধিকার। বেদবেদান্ত আর অবতার যা কিছু করে গেছেন তিনি একলা তাঁর নিজের জীবনে তা করে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝলে বেদ-বেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না, কেননা, He was the explanation অর্থাৎ তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন। বিবেকানন্দ বলেন—তিনি (রামকৃষ্ণ) যেদিন জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পতিত-বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ সবকিছু দূর করে দিয়ে গেলেন। বিবাদ-ভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান ভেদ, খ্রীশ্চান-হিন্দু ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ ভেদাভেদের লড়াই ছিল অন্যযুগের, এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। রামকৃষ্ণ ধরাধামে এসেছিলেন বলেই আজ আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি কত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। যতকিছু ছিল আমাদের মধ্যে জমাটবাধা আবর্জনা, রামকৃষ্ণের শিক্ষায় তা ধুয়ে পুছে গেছে। এখন আর চণ্ডীমণ্ডপে বসে দল পাকিয়ে কাউকে একঘরে করবার রেওয়াজ নেই, এখন আর পাঁতিপত্র দিয়ে নারীকে সমাজচ্যুত করবার ব্যবস্থা নেই, আর নেই জাত জাত করে গলা ফাটান বক্তৃতা করার কার্যসূচী। এখন সবই একাকার হয়ে গেছে, নেই আর কোন বাধানিষেধ।

আত্মারটা শক্তির বিকাশ ও শিবজ্ঞানে জীবের পূজা

(বীর সন্তান নরেন্দ্রনাথ সঙ্গে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহসা নরেনের হাত ধরে দরবিগলিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে পূর্বপরিচিতের ন্যায় বলতে লাগলেন, এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করে রয়েছি তা একবার ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমার কান ঝল্‌সিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, প্রাণের কথা কাউকে বলতে না পেরে আমার পেট ফুলে রয়েছে। তারপরই ঠাকুর নরেনের সম্মুখে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান হয়ে দেবতার মত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বলতে লাগলেন, আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ।

নরেন ঠাকুরের এই উন্মাদের ন্যায় আচরণ দেখে ও কথা শুনে একেবারে নির্বাক স্তম্ভিত। এই নরেন গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটের বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বা বীর সন্ন্যাসী বলে ও রামকৃষ্ণনন্দন বলে পরিচিত। যিনি রামকৃষ্ণের কল্পনা ও বাক্যকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন, যিনি গুরু রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণীকে পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচার করে গুরুর আদর্শকে চির-জাগ্রত ও চির-ভাস্বর করে রেখেছেন, যিনি গুরুর উপদেশ শিব-জ্ঞানে জীবের সেবা নয় 'পূজা' করবার জন্য রামকৃষ্ণমিশন ও বেলুড়-মঠ স্থাপন করে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করে গেছেন—সেই নরেন দত্তের সাথে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিমলার সুরেন মিত্রের বাড়ীতে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন সুরেন মিত্রের বাড়ী। তিনি ভজন কীর্তন পছন্দ করেন বলে সুগায়ক এফ, এ, পরীক্ষার্থী এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন দত্তকে ডেকে নিয়ে এলেন সুরেন মিত্র। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর বিমোহিত হয়ে গেলেন, গান শেষ হবার পর নিজে যুবক নরেনের কাছে গিয়ে তাকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এর পূর্বে কিন্তু ঠাকুর ডাঃ রাম দত্ত ও সুরেন মিত্রকেও অনুরোধ করেছেন একদিন এই যুবককে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাবার জন্য।

শ্রীভগবানের কৃপায় নরেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ দেহ, অপূর্ব মেধা এবং ধ্যান-ধারণা ও ভগবৎ ভক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে, তর্কস্থলে, ধ্যানধারণা, আসন-প্রাণায়াম, শরীরচর্চা ক্ষেত্রেই উন্নত ছিলেন না, তিনি সঙ্গীত বিদ্যায়ও ছিলেন পারদর্শী, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরেও নরেনের ডাক আসতো এবং ব্রাহ্ম-সমাজের ভজন গানের আসরে নরেনের স্থান উচ্চেই ছিল। এক কথায় বলা চলে নরেন ছিলেন সর্বদিক দিয়েই পারদর্শী। শিশু-বেলা থেকেই নরেনের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষের শিশু নরেন্দ্রনাথ শুকদেবের ন্যায় মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং ৬ষ্ঠ বর্ষে রামায়ণের পালা-গান ছিল তাঁর মুখস্থ। পাড়ার কোথাও রামায়ণ-গান হলে শিশু নরেন্দ্র উপস্থিত থেকে অধিকারীর ভুলে-যাওয়া অংশ সুললিত কণ্ঠে গেয়ে অথবা অধিকারী অনুপস্থিত থাকলে পুরা রামায়ণ-পালা গেয়ে সকলকে মোহিত করে দিতেন। নরেন্দ্র নাথের স্মৃতি-শক্তি যেরূপ ছিল তীক্ষ্ণ তদ্রূপ তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একবার যা তিনি পড়তেন বা শুনতেন তা কখনও তিনি ভুলে যেতেন না। শিশুবেলা থেকে যৌবন-কাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করবার ফলে নরেনের দ্রুত পাঠ-শক্তি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ বলতেন, এখন থেকে কোন পুস্তক পাঠ করতে বসলে পুস্তকের প্রতিছত্র পর

পর পড়ে গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝবার আবশ্যক হত না, প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করলেই এর ভেতর কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারতাম। ক্রমান্বয়ে এই শক্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে প্রতি প্যারাও পড়বার প্রয়োজন হত না, প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চয়ন পড়েই বুঝে ফেলতাম পৃষ্ঠার বিষয়-বস্তু।

পরবর্তীকালে তিনি বড় বড় গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে উল্‌টিয়ে পুস্তকের বিষয়-বস্তু নিখুঁত ভাবে আবৃত্তি করতেও পারতেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পূর্বে ভারতীয় মুনি ও ঋষিবৃন্দ গুরুগৃহ থেকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, কলা, স্মৃতি প্রভৃতির পাঠ মুখে মুখেই গ্রহণ করতেন এবং চিরকাল ঐ বিদ্যা তাঁদের স্মৃতি-পটে আঁকা থাকতো যা তাঁরা পরবর্তীকালে গুরু-দত্ত বিদ্যা ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও মুনি ঋষিদের সেই স্মৃতি-শক্তির উৎস দেখা গিয়েছে। পৃথিবীর তর্ক-শাস্ত্রের বিভিন্ন পুস্তক অধ্যয়নের ফলে নরেন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত তার্কিকে পরিণত হয়েছিলেন। তর্কশাস্ত্রের প্রতি প্রশ্ন ও নিখুঁত উত্তর তাঁর আয়ত্তের ভেতর ছিল বলেই তর্ককালে বাদীর দু-একটা উত্তর শুনেই তিনি বুঝতে পারতেন তর্কের গতিপথ, তাই তর্ক-স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় প্রায় সকলেই ভেসে যেত।

নরেন্দ্রনাথ বলতেন, পৃথিবীতে কয়টাই বা তর্কের স্তর আছে? ঐগুলি আয়ত্ত করতে পারলেই তর্কে জয়ী হওয়া ক্লেশকর নয়! জগৎকে নূতন ভাবে চিন্তা করতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জন্ম-গ্রহণ করেন, সুতরাং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি প্রমাণ প্রযুক্ত হয়েছে জানা থাকলে বা নিজ আয়ত্তের মধ্যে থাকলে কাউকে ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হয় না, কারণ বাদী যে কথা যে ভাবেই সমর্থন করুক না কেন তা ঐ সকলের মধ্যে পড়বেই পড়বে।

রামকৃষ্ণের সাথে নরেনের দ্বিতীয় মিলনের পর যে ঘটনাবলী ঘটেছিল তাতে নরেনের মনে এই ধারণাই হয়েছিল যে রামকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ

উন্মাদ ছাড়া আর কিছুই নহেন কারণ বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথকে যিনি দেবতার ন্যায় হাত জোড় করে স্তব করতে পারে তিনি উন্মাদ ছাড়া আর কি হতে পারেন? কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন রামকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত বাণী শুনলেন তখনই তাঁর এই ভুল ধারণা না ভাঙ্গলেও মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—কই, এঁর কথাবার্তা ও আচরণের মধ্যে তো উন্মাদের লক্ষণ কিছুই নেই। ঠাকুরের সদালাপ ও ভাব সমাধি দেখে মনে হয় সত্যসত্যই ইঁনি ঈশ্বরের জন্য সর্বত্যাগী এবং যা বলেছেন স্বয়ং অনুষ্ঠান করেই বলছেন। এইরূপ যখন নরেন চিন্তা করছিলেন তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবমুখে বলছেন, তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সাথে যেমন কথা বলছি ঐরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁর সাথে কথা বলা যায় কিন্তু ঐরূপ কে করতে চায়? লোকে স্ত্রী-পুত্রের শোকে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না বলে ঐরূপ কে করে বল? তাঁকে পেলাম না বলে যদি কেউ ঐরূপ ভাবে ব্যাকুল হয়ে ডাকে ও কাঁদে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেন। নরেন ঠাকুরের মুখে ঐ সকল কথা শুনে ভাবছেন—রামকৃষ্ণ পরমহংস তো অন্যান্য ধর্ম প্রচারকের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায়তা লয়ে ঐরূপ বলছেন না। সত্য সত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করে এবং সম্পূর্ণ মনে ঈরশ্বকে ডেকে যা প্রত্যক্ষ দেখছেন তাই বলছেন! পূর্ব আচরণ ও বর্তমান কথাবার্তা ও ভাব সমাধি প্রভৃতির সাথে তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় 'এবারক্রম্বি' প্রভৃতি ইংরাজ দার্শনিকবৃন্দ যে সকল অর্ধ উন্মাদের কথা উল্লেখ করেছিলেন নরেনের মতে ঠাকুরও অর্ধ উন্মাদ হবেন কিন্তু তার পরই পুনঃ এই ধারণা জন্মাল—ঠাকুর পরমহংসের ঈশ্বরের জন্য অদ্ভুত ত্যাগের ও মহিমার কথা ভুলতে পারা যায় না। ক্ষণেক চিন্তার পর নরেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন, উন্মাদ হোয়েও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী, যে জন্য ইনি সহজেই মানব-হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাবার যথার্থ অধিকারী।

প্রথম দর্শনের পর থেকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেনকে আত্মজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন, ও অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপাত করতেন। দ্বিতীয় মিলনের দিন নরেন চলে যাবার পর থেকে দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত ঠাকুর নরেনের জন্য কিরূপ অস্থির হোতেন তা ঠাকুরের কথায় উপলব্ধি করা যায়, "সময় সময় এমন যন্ত্রণা হোত—যেন মনে হোত বুকের ভেতরটা কে গামছা নিংড়াবার ন্যায় নিংড়াচ্ছে। তখন আর সামলাতে পারতাম না, ছুটে বাগানের উত্তর দিকের ঝাউতলায় (যেখানে কেউ বড় একটা যায় না) গিয়ে বলতাম—ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না। বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতাম। খানিকটা এরূপ ভাবে কেঁদে তবে আপনাকে সামলাতে পারতাম, ক্রমান্বয়ে এরূপ ভাবে ছয় মাস কেটে গেল। প্রথম দর্শনের পর থেকেই রামকৃষ্ণের 'নরেন প্রীতি' বর্ণনাতীত ছিল বলেই রামকৃষ্ণ নরেনের জন্য আকুল হোতেন, কারণ, ঠাকুর জানতেন—নরেন কে ? কোথা থেকে এসেছে ? কেন এসেছে ? কতদিন পৃথিবীতে থাকবে প্রভৃতি। ঠাকুর এও জানতেন, নরেন ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ—পৃথিবীর মঙ্গল সাধনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব—তবে নরেন যে দিন বুঝতে পারবে—সে কে, সেদিন আর নরেন ইহলোকে থাকবে না—দৃঢ় সংকল্প সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে। এই তথ্য ঠাকুর নরেনের সাথে তৃতীয় মিলনের দিন, নরেনের ভাবস্থ অবস্থায় জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি ভক্তমণ্ডলীকে সর্বদা সাবধান করে বলতেন, 'তবে একথা বলতে মানা', অর্থাৎ নরেনের নিকট এগুলি বলা চলবে না।

নরেন অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তৎসঙ্গে ছিল তাঁর দৃঢ় মানসিক বল যার জন্য তিনি কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করলেও গ্রাহ্য করতেন না। প্রথম প্রথম নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণকে সাধারণ স্তরের লোকের মধ্যেই ফেলেছিলেন। তিনি ঠাকুরকে 'দেবমানব' বলে যেমন গ্রহণ করতে পারেন নি তদ্রূপ উন্মাদ বা অর্ধ উন্মাদ ভাবতেও

এতটুকুও কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু ঘটনা-পরম্পরায় যখন নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, ঠাকুরের সামান্য একটু স্পর্শে তাঁর মত শক্তিশালী ব্যক্তি কাদার ড্যালার ন্যায় তালগোল পাকিয়ে গিয়েছেন, ভাব-সমাধিতে নরেন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে গিয়েছেন, যখন নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন ঠাকুরের স্পর্শে ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালগুলির সাথে ঘরের সমস্ত দ্রব্যাদি বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বের সাথে নরেনের আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহা-শূন্যে একাকার হয়ে ছুটে চলেছে তখন নরেন্দ্রনাথ দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে মনে করলেন—আমিত্বের নাশই মৃত্যু। সেই মরণ তাঁর সম্মুখে, অতি নিকটে, তখন নরেন্দ্রনাথ সামলাতে না পেরে, চীৎকার করে কেঁদে বলে উঠলেন 'ওগো তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ মা আছেন।' এরপর ঠাকুরের সামান্য স্পর্শেই ঐ ভাব চলে গিয়ে নরেন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। নরেন ঠাকুরের এই দৈবী-শক্তিকে মোহিনী বিদ্যা বা সম্মোহন বিদ্যা বলে ধারণা করলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার মনে এই চিন্তার উদয় হোল—শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বল ইতর সাধারণকেই মোহিত করতে পারে, নরেন তো আর ইতর সাধারণের ন্যায় রামকৃষ্ণের হাতের ক্রীড়ার পুত্তলি নয়, তবে কেন নরেন এরূপ ভাবে মোহিত হয়েছেন। এর পরই নরেনের মনে এই ভাবের উদয় হোল—ইনি সামান্য মানব নহেন! রামকৃষ্ণ দৈবশক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ, যিনি ইচ্ছা মাত্রেই নরেনের ন্যায় ব্যক্তিকে উচ্চ পথে চালিত করতে পারেন এবং এই মহামানবের কৃপালাভ নরেনের মত ব্যক্তির পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তারপরই রামকৃষ্ণকে জানবার তীব্র বাসনা নরেনের মনে জাগরিত হোল। অথচ রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মালেও তাঁর কার্যাবলী পরীক্ষা না করে এবং স্বয়ং অনুভব ও প্রত্যক্ষ না করে নরেন তাঁর অদ্ভুত দর্শন সম্বন্ধীয় কোন কথা গ্রহণ করবে না, এতে যদি রামকৃষ্ণের অপ্রিয়ভাজনও হোতে হয় তাও স্বীকার।

ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নরেনের মনে ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে সত্যি এবং ঠাকুরকে সদ্‌গুরু রূপে মনে হোলেও নরেন নির্বিচারে তাঁর সকল কথা গ্রহণ করতে এখনও সম্মত নহেন, তাই যখন তখন্‌ দক্ষিণেশ্বর না গিয়ে মধ্যে মধ্যে যেতেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ছাড়তেন না।

রামদয়াল, রাখাল ও বাবুরাম এসেছেন দক্ষিণেশ্বর, এর সপ্তাহ-খানেক পূর্বে নরেনও দক্ষিণেশ্বর এসেছিলেন। সেদিন ধর্ম-বিষয়ক নানা আলোচনার পর আহারাদি সেরে রাত্রি ১০টার পর ঠাকুর ও রাখাল ঠাকুরের ঘরে এবং রামদয়াল বাবু ও বাবুরাম উত্তর দিকের বারাণ্ডায় শয়ন করলেন। এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই ঠাকুর তাঁর পরণের কাপড়খানা বালকের ন্যায় বগলদাবা করে ঘরের বাইরে এসে রামদয়ালকে ডেকে বললেন, ওগো ঘুমলে? ওরা দুজনে শশব্যস্ত হোয়ে উঠে বসে বললেন, আজ্ঞে না! নরেন-অন্ত-প্রাণ ঠাকুর বললেন, দেখ—নরেনের জন্য প্রাণের ভেতরটা যেন গামছা নিংড়াবার মত জোরে মোচড় দিচ্ছে, তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে শুদ্ধসত্বগুণের আধার সাক্ষাৎ নারায়ণ! তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারি না। ঠাকুর তখন ভাবাবিষ্ট ছিলেন, তিনি সমস্ত রাত্রি নরেনের গুণাবলী ও বিভিন্ন দিক্‌ দর্শনের কথা বললেন। আর একদিন বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল দক্ষিণেশ্বর এসে বুঝতে পারলেন ঠাকুর একেবারে নরেনময় হয়ে রয়েছেন। অনেক দিন দক্ষিণেশ্বর না আসবার জন্য ঠাকুর অনবরত নরেনের গুণগান কর-ছেন, নরেন ছাড়া ঠাকুরের মুখে আর কোন কথা নাই। নরেনের বিষয় আলোচনাকালে মাঝে মাঝে ঠাকুর বলছেন, আমি দেখছি সে (নরেন) অখণ্ডের ঘরের চারজনার একজন এবং সপ্তর্ষির একজন! বলতে বলতেই তিনি পুত্র-শোকাতুরা জননীর ন্যায় অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। বেশী ভক্ত উপস্থিত থাকলে তিনি বাইরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে জানাতেন, মাগো! আমি তাকে না দেখে থাকতে

পাচ্ছি না। নিজের ঘরে এসে সকলের নিকট বলতেন, এতো কাঁদ-লুম কিন্তু নরেন তো এলো না, তাকে দেখবার জন্য প্রাণে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিচ্ছে। আমার এই টানটা সে কিছুই বুঝে না। তারপর ভক্তদের লক্ষ্য করে বলতেন, বুড়ো মিনসে আমি, তার জন্য অস্থির হয়েছি ও কাঁদছি দেখে লোকেই বা কি বলবে বল দেখি? তোমরা আমার আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না কিন্তু অপরে দেখলে কি ভাববে বল? এই সব ঘটনার কিছুদিন পরেই ঠাকুর পরমহংসের জন্মতিথি উৎসব। ভক্ত-মণ্ডলী একে একে উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু যার জন্য তিনি এত অস্থির চঞ্চল, সেই নরেন এখনও উৎসব-সভায় উপস্থিত হন নাই। ঠাকুরের মাঝে মাঝে ভাবসমাধি হচ্ছে বটে তবু যেন তাঁর মধ্যে কিসের একটা অভাব সকলে দেখতে পাচ্ছেন—সে অভাবটা আর কিছুই নয়, নরেন এখনও এসে পৌঁছায় নাই তাই ঠাকুর এত চঞ্চল—তাঁর মনে শান্তি নেই—নেই উৎসবের আনন্দ। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ বলছেন, তাই তো লরেন্দ্র আসল না। তিনি যেন নরেনের অদর্শনে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন।

এসেছেন রামকৃষ্ণের অন্তরের ধন নরেন্দ্রনাথ, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পর। নরেন ঠাকুরের পদপ্রান্তে প্রণাম করা মাত্রই রামকৃষ্ণ লাফিয়ে নরেনের কাঁধে উঠে বসে ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় ফিরে আসামাত্র তিনি নরেনকে খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নরেনের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে পর তিনি অপরের প্রতি নজর দিলেন। নরেনের প্রতি ঠাকুরের অসম্ভব ভালবাসা দেখে ভক্তমণ্ডলী অবাক হোয়ে ভাবতেন—সর্বস্বত্যাগী দেবমানব পরমহংস রামকৃষ্ণ যার জন্য এত চিন্তা করেন ও এত ভালবাসেন তিনি নিশ্চয়ই দেবতুল্য কেউ হবেন।

শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) প্রভৃতি নরেনের সাথে আলাপ করে প্রথম প্রীত হোতে পারেন নাই। কারণ নরেনের বাহ্য আচরণে

তাঁকে প্রথম দাম্ভিক, উদ্ধত এবং অনাচারী বলে তাঁদের ধারণা হয়েছিল। ঠাকুর কিন্তু এদের মত ঐরূপ ভ্রমে পতিত হন নাই। নরেন যত রামকৃষ্ণের নিন্দা করতেন, গালাগালি দিতেন ও মূর্খ বলে সকলকে বলে বেড়াতেন, রামকৃষ্ণ ততই নরেনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হোতেন। এমন কি বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ জগৎখ্যাত কেশব সেন ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্ম ভক্তদের সম্মুখেও রামকৃষ্ণ যুবক নরেনের এত প্রশংসা করেছিলেন যার জন্য নরেন তীব্র প্রতিবাদ তুলে বলেছিলেন, মশায় করেন কি! লোকে আপনার ঐ কথা শুনে আপনাকে উন্মাদ বলবে। কোথায় জগৎবিখ্যাত কেশব সেন, আর মহামনা বিজয়কৃষ্ণ আর কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য কলেজের ছোঁড়া। আপনি তাঁদের সাথে আমার তুলনা আর কখনও করবেন না। উত্তরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, কি করব রে, তুই কি ভাবিস—আমি ঐরূপ বলেছি। মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐরূপ দেখালেন তাই বলছি, মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই, তাই বলছি! এই কথা শুনে 'তরুণ নরেন' কোথায় সকলের ন্যায় আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে যাবেন তা না, দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, মা দেখিয়েছেন, না এগুলি আপনার মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়েছে তা কে বলতে পারে?

রামকৃষ্ণ যিনি উচ্চাঙ্গের সাধক ও দেবমানব বলে পরিচিত তাঁর কথার এরূপ স্পষ্ট সমালোচনা নরেন ছাড়া আর কেউ করতে সাহস করে নাই। আমার ঐরূপ হলে পর, আমি অন্ততঃ মনে করতাম, আমার মাথার খেয়ালের জন্যই ঐরূপ হয়েছে! আপনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন ও স্নেহ করেন সেই জন্যেই হয়তো আপনার ঐরূপ দর্শন উপস্থিত হয়, বলে নরেন পাশ্চাত্ত্যের কতকগুলি নজির ঠাকুরকে বললেন।

ঠাকুর যখন ভাবমুখে থাকতেন তখন নরেন্দ্রের ঐ বালসুলভ বাক্যকে সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক ভেবে, নরেনের উপর অধিকতর প্রসন্ন

হোতেন কিন্তু তিনি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতেন তখন তীক্ষ্ণ যুক্তি ও সমালোচনাগুলি ঠাকুরকে বিচলিত করে দিত, তিনি ভাবতেন তবে কি আমার দর্শনের মধ্যে কোনরূপ ভ্রম আছে? পুনঃ তিনি ভেবে বলছেন, আমি তো ইতঃপূর্বে নানারূপ পরীক্ষা করে দেখেছি, মা আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই এবং তাঁর শ্রীমুখ থেকে বারংবার আশ্বাসও পেয়েছি। তবে সত্যপ্রাণ নরেন, আমার দর্শন মাথার খেয়ালে উপস্থিত হয়, একথা বলে কেন? কেন তার (নরেনের) মন, বলবামাত্র ঐসকল সত্য বলে উপলব্ধি করে না? ঐরূপ ভাবনায় পতিত হয়ে ঠাকুর মীমাংসার জন্য অবশেষে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, "ওর (নরেন্দ্রের) কথা শুনিস্ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন) সব কথা সত্য বলে মানবে"। তাই ঠাকুর বলেন—

"জ্ঞানীর পথ বিচারের পথ। বিচার করতে করতে নাস্তিক-ভাব হয়তো কখন কখন এসে পড়ে। ভক্তের আন্তরিকতাকে জানবার ইচ্ছা থাকলে, নাস্তিক ভাব এলেও ঈশ্বর-চিন্তা ছেড়ে দেয় না। যার বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, শুখার বৎসরে ফসল না হলেও সে চাষ করে।"

নরেন কিছুদিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর আসছেন না—ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, কেন নরেন আসছে না। তিনি ঠিক করলেন, এক রবিবার নরেনের সাথে দেখা করতে যাবেন কলকাতায়। অন্য সময় গিয়ে যদি তার সাথে দেখা না হয় কারণ নরেন তো বহু কাজে লিপ্ত থাকে, বিশেষত ধ্যানাভ্যাস, কলেজের পড়া, সঙ্গীতচর্চা, ব্যায়ামাদি করা এবং বন্ধুদের নিয়ে ব্রাহ্মদের অনুসরণে কলকাতার নানাস্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা-সভার সাথে সমিতি গঠন প্রভৃতি বহু প্রকারের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে, সুতরাং তাকে একমাত্র সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় প্রার্থনা-সভাতেই দেখতে পাওয়া যাবে ভেবে ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনা কালে

উপস্থিত হোলেন। ঠাকুরের মনে যদিও এই সন্দেহ জাগরিত হয়েছিল তথায় যাবেন কিনা বা যাওয়া কর্তব্য কিনা, কিন্তু সরল ঠাকুর ভাবলেন—কেশব, বিজয় ও অপরাপর ব্রাহ্মভক্তগণ তো প্রায়ই তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করেন, কেশব আলাদা ব্রাহ্মমন্দির করেছেন, তথায় তো তিনি কয়েকবার গিয়েছেন, তারা তো কই অসন্তুষ্ট হননি। এই ভেবে ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নরেনের সাথে দেখা করতে উপস্থিত হোলেন। ব্রাহ্মদের ধ্যান ও উপাসনা শেষ হবার পর যখন ব্রাহ্ম আচার্য বেদী হতে ঈশ্বরীয় উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ব্রাহ্মদের অনেকেই ঠাকুরকে পূর্বে দর্শন করেছে সুতরাং ঠাকুর রামকৃষ্ণের আগমন বার্তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা ঠাকুরকে পূর্বে দেখে নাই তারা বেঞ্চির উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে লাগলেন। ব্রাহ্ম-আচার্য মন্দির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখে নিজ কার্যসাধনে বিরত রইলেন। ভজন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বসেছিলেন। তিনি, ঠাকুর সহসা কেন এসেছেন বুঝে, তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু আচার্য্য বা অপর প্রধান ব্রাহ্মভক্তেরা কেউ তাঁকে সাদর আহ্বান তো করলেনই না, বরং রামকৃষ্ণকে ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে মতদ্বৈত আনয়ন-কারী মনে করে ঠাকুরের প্রতি সাধারণ শিষ্টাচার প্রদর্শনেও তাঁরা উদাসীন ছিলেন। অথচ রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মমন্দিরে আসবার পূর্বে সত্য-প্রিয় ব্রাহ্মগণ সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই এককালে সংগ্রাম করেছেন, সুতরাং ঠাকুরকে তাঁরা সহজ ভাবেই গ্রহণ করবেন এই ছিল তাঁর ধারণা—যার জন্য সংবাদ না দিয়েই তিনি চলে এসেছেন। ব্রাহ্ম-প্রধানরা রামকৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিভেদ-সৃজনকারী মনে করে তাঁর প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন তো করলেনই না, অধিকন্তু তিনি যখন সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তখন ঐ সমাধিস্থ অবস্থা দেখবার জন্য মন্দির-মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা বেড়েই চললো তখন তাঁরা মন্দিরের গ্যাসের আলো নিবিয়ে দিলেন। বাতি নিবিয়ে দেবার ফলে

মন্দিরের বাইরে আসবার জন্য ভক্তদের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। ঠাকুরকে সম্মান প্রদর্শন না করায় নরেন অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তারপর অন্ধকার গৃহ হতে তাঁকে কিভাবে নিয়ে আসবেন এই চিন্তায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন, কারণ ঠাকুর তো সাধারণ অবস্থায় আর নেই, তিনি তখন সমাধিস্থ, বাহ্যজ্ঞান-রহিত অবস্থায় আছেন। নরেন তখন উপায়ান্তর না দেখে মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে কোন প্রকারে ঠাকুরকে বাইরে নিয়ে এসে তাঁকে গাড়ীতে উঠিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিলেন। আজ নরেনের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, যদিও নরেন ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে এখনও পারেন নাই তত্রাচ তিনি যে একজন দেবতুল্য সর্বস্বত্যাগী পুরুষ এ বিশ্বাস তো নরেনের জন্মেছে, তাই তিনি অনুশোচনা করে প্রায়ই বলতেন—আমার জন্যই ঠাকুরকে ঐরূপ অবস্থা হোতে হয়েছিল, তবে ঐ জন্য ঠাকুরকে নরেন যথেষ্ট তিরস্কারও করেছিলেন।

একদিন নরেন ঠাকুরকে বললেন—আপনি কেবল আমার কথা ভাবেন কেন? আমার কথা ভাবতে ভাবতে আপনার অবস্থাও দেখেছি ভরত রাজার ন্যায় হবে।

নরেনের এই কথা শুনে সরল ঠাকুর বালকের ন্যায় বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছিস্, তাই তো রে, তাহলে কি হবে? আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না।" দারুণ বিমর্ষ হয়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐ কথা জানাতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, "যা শালা! আমি তোর কথা শুনব না। মা বললেন—তুই ওকে (নরেনকে) নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস। যেদিন ওর (নরেনের) ভেতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখ দেখতে পারবি না।"

তারপর ঠাকুর নিজে যা কখনও করতেন না এবং আহার, বিহার নিদ্রা জপ ধ্যানাদি সম্বন্ধে নিজে যা আচরণ করতেন, তা তিনি ভক্তমণ্ডলীকে পালন করতে উপদেশ দিতেন, কিন্তু তার ব্যতিক্রম দেখা

যেত নরেনের ব্যাপারে। নরেন ঐ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম করলেও তার কোন ক্ষতি হবে না—বলতেন ঠাকুর, কারণ নরেন হোল নিত্য-সিদ্ধ, ধ্যানসিদ্ধ। নরেনের ভেতর জ্ঞানাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত থেকে ওর সর্বপ্রকার আহার্য দোষকে ভস্ম করে দিচ্ছে, সেজন্য নরেন যেখানে সেখানে যা'তা আহার করলেও তার মন কলুষিত হবে না বা বিক্ষিপ্ত হবে না, জ্ঞান-খড়্গ সহায়ে সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেল্‌ছে, সুতরাং মহামায়া কোনমতে নরেনকে নিজায়ত্বে আনতে পারছেন না।

একদিন নরেন হোটেল থেকে খেয়ে এসে বলছেন, মশায়! আজ হোটেলে সাধারণে যাকে 'অখাদ্য' বলে তাই খেয়ে এসেছি। নরেনের উদ্দেশ্য ঠাকুরের নিকট বাহাদুরী ফলান নয়, তাঁর উদ্দেশ্য সত্য কথা অকপটে ঠাকুরকে বলা। কারণ হোটেলে খেয়ে আসার জন্য যদি ঠাকুরকে স্পর্শ করতে বা ঘটিবাটি প্রভৃতি পাত্র ব্যবহার করতে আপত্তি ওঠে তজ্জন্যই এই সকল বললেন ঠাকুরকে। ঠাকুরও নরেনের উদ্দেশ্য বুঝে সকলকে বললেন, তোর তাতে দোষ লাগে না। শুয়ার, গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে তাহলে উহা হবিষ্যান্নের তুল্য, আর শাক পাতা খেয়ে যদি বিষয় বাসনায় ডুবে থাকে তা শুয়ার গরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। তুই অখাদ্য খেয়েছিস তাতে আমার কিছু মনে হচ্ছে না কিন্তু অপরে (সকল ভক্তকে দেখাইয়া) যদি কেউ ঐকথা বলতো তা হলে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতাম না। এই সকল ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে কেবল ভালই বাসতেন না, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বলে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন নরেনকে এত ভালবাসতেন, কেন তাঁর অদর্শনে কাঁদতেন তাতো তাঁর কথা, বর্ণনা এবং উপদেশের মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন দেবমানব, উচ্চস্তরের মাতৃসাধক ও দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন মহামানব। তাই তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেতেন—

নরেন 'কে' এবং নরেনের শক্তির বিকাশ রয়েছে কত সুদূরপ্রসারী। তিনি দেখতে পেতেন—নরেনের মধ্যে রয়েছে **আঠারটা শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ!** ঠাকুর দেখতে পেয়েছিলেন নরেনের মধ্যে মহাযোগীর ভাব—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও নরেনের মধ্যে মহাযোগীর লক্ষণ দেখে বলেছিলেন, 'এর ভেতর যোগীর লক্ষণ সকল প্রকাশিত রয়েছে। নরেন ধ্যানাভ্যাস করলে যোগশাস্ত্রের নির্দিষ্ট ফল সকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করতে পারবে।' রামকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে তাঁর বাণী পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচারিত করে ভারতবর্ষের নাম ও কীর্তি উচ্চে স্থাপন করতে সমর্থ হবে। তাই তিনি প্রথম দর্শনের পর থেকেই নরেনের প্রতি আকৃষ্ট। কত লোক কত রকমে নরেন্দ্র সম্পর্কে ঠাকুরের নিকট নালিশ করতো। তদুত্তরে কিন্তু ঠাকুর তাদের গালাগালিই করতেন। নরেন কোন অকাজ করতে পারে এ ধারণা ঠাকুরের মনে কখনও উদয় হোত না, তাই তিনি নরেনকে এত ভালবাসতেন ও বলতেন—নরেনকে আমি শ্রদ্ধা করি।

নরেনকে ঠাকুর যেমন ভালবাসতেন তদ্রূপ তাঁকে পরীক্ষাও করেছেন অনেক প্রকারে। আবার ঠাকুরকেও নরেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, ভালও বাসতেন অথচ পরীক্ষা করতে একটুও কসুর করেন নাই। ঠাকুর নরেনের এই পরীক্ষাকে সমর্থন করে বলতেন—সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি; তবেই সাধুকে বিশ্বাস করবি। সাধু অপরকে যা শিক্ষা দেয় স্বয়ং তা করে কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবি; যে সাধুর কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে মিল নেই তার কথায় বিশ্বাস নেই।

ঠাকুর যখন 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলতেন এবং বলতেন যে 'কাঞ্চনের স্পর্শ তিনি সহ্য করতে পারেন না, এই কথার সত্যতা পরীক্ষা করবার জন্য নরেন, ঠাকুরের অজ্ঞাতে একটি মুদ্রা রেখে দিলেন ঠাকুরের বিছানার তলায়। এর পর নরেন দেখতে পেলেন যতক্ষণ ঐ মুদ্রাটি বিছানার নিচে ছিল ঠাকুর ততক্ষণ বিছানায় বসতেই পারেন

নাই, বিছানায় বসতে গেলেই যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বালা অনুভব করছেন। ঠাকুরকে কেবল যে নরেন একাই পরীক্ষা করেছেন তা নয়। মথুরবাবুও রামকৃষ্ণকে বহুভাবে পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারলেন যে ঠাকুর সিদ্ধ মহাপুরুষ তখন মথুর রামকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। নরেনও ঠাকুরকে বহুভাবে পরীক্ষা করে যখন বুঝতে পারলেন যে রামকৃষ্ণ মহামানব, তিনি ইচ্ছামাত্রে নরেনের ন্যায় ব্যক্তিদের অহমিকা চূর্ণবিচূর্ণ করে সুপথে চালিত করতে পারেন তখন তিনি রামকৃষ্ণচরণে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে অর্পণ করলেন। ঠাকুরও নরেনকে বহুরকমে পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে একমাত্র নরেনই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। ঠাকুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল বিদ্যমান থাকতেও তাঁর উত্তরাধিকারী করে যান নরেনকে এবং মানসপুত্ররূপে কাছে রাখলেন রাখালকে এবং অপরাপর কজন ঈশ্বকোটি ভক্ত তো আছেই।

রামকৃষ্ণের আবির্ভাব জীবের উদ্ধারের জন্য, সেই জন্যই উপযুক্ত পাত্র হিসাবে নরেনকেই তিনি বেছে নিলেন। ঠাকুর নরেনের মুখশ্রী দেখে বলতেন—এরূপ চক্ষু কি শুধু শুষ্ক জ্ঞানীর হোয়ে থাকে? জ্ঞানের সাথে রমণীসুলভ ভক্তির ভাব তোর ভেতর বিলক্ষণ রয়েছে, পুরুষোচিত ভাব যার থাকে তার স্তনের চারিদিকে ভেলার ন্যায় (কাল) দাগ থাকে না, মহাবীর অর্জুনেরও ঐরূপ ছিল।

নরেনকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, নরেন দেরী করে এলে কেঁদে কেটে অস্থির হোতেন, তারপর দূরে নরেনকে দেখতে পেলেই ঐ ন,—ঐ ন—বলে ভাবস্থ হয়ে পড়তেন। নরেন দক্ষিণেশ্বরে কদিন দেরী করে আসলে ঠাকুর নিজে এসে উপস্থিত হোতেন নরেনের সাথে দেখা করতে কলকাতায়। এর পর থেকে নরেন প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রীতিমত ভাবে আসতে লাগলেন।

একদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন কিন্তু মজা এই, যে নরেনকে দেখামাত্র ঠাকুর অত্যন্ত চঞ্চল হোয়ে উঠতেন, তিনি আজ নরেনের

সাথে কথাই কইলেন না। ঠাকুর ভাবসমাধিতে আছেন বুঝে অগত্যা কিছুক্ষণ পরে ঘরের বাইরে গিয়ে হাজরার সাথে গল্প করে তামাক সেবনের পর ঠাকুর ভক্তদের সাথে কথা কইছেন শুনতে পেয়ে ঠাকুরের ঘরে এসে দেখলেন যে, তিনি অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখে সন্ধ্যার পর তাঁকে প্রণাম করে নরেন কলকাতায় চলে এলেন।

এরূপ ভাবে প্রায় একমাস নরেন দক্ষিণেশ্বর যাওয়া-আসা করেছেন কিন্তু ঠাকুর নরেনের সাথে একটাও কথাবার্তা বলছেন না —আদর আপ্যায়ন তো দূরের কথা। এরপর একদিন নরেন এসে-ছেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন আচ্ছা, আমি তো তোর সাথে একটা কথাও কই না তবু তুই এখানে কি করতে আসিস্, বল্ দেখি? উত্তরে নরেন বললেন—আমি কি আপনার কথা শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা করে তাই আসি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রসন্ন চিত্তে বললেন, আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা) করে দেখছিলাম, আদর যত্ন না পেলে তুই পালাস কিনা? তোর মত আধারই এতটা (অবজ্ঞা) সহ্য করতে পারে, অপরে এতদিন কোনকালে পলায়ন করতো, এদিক আর মাড়াত না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকুর হয়তো নরেনকে পুনরায় পরীক্ষা করবার মানসে একদিন বললেন, ছাখ, তপস্যা প্রভাবে আমাতে 'অনিমাদি বিভূতি সকল' অনেককাল হোল উপস্থিত হোয়েছে, কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যার পরিধানের কাপড় ঠিক থাকে না তার ঐ সব যথাযথ ব্যবহার করবার অবসর কোথায়? তাই ভাবছি, তোকে এই সকল প্রদান করি। কারণ মা জানিয়ে দিয়েছেন—তোকে তাঁর অনেক কাজ করতে হবে, তোর ভেতর ঐ শক্তি সঞ্চালিত হোলে কার্যকালে ঐগুলি ব্যবহারে লাগাতে পারবি, কি বলিস?

নরেন এখন আর ঠাকুরের কথা অবিশ্বাস করেন না। ঠাকুরের প্রভাবে অনেক দৈব শক্তি নিজে দেখেছেন। তাই নরেন চিন্তিত হোয়ে জিজ্ঞেসা করলেন—ঐসকল দ্বারা আমার ঈশ্বর লাভের সহায়তা হবে কি ?

ঠাকুর বললেন—না, তবে ঈশ্বর লাভ করে যখন তাঁর কাজ করতে প্রবৃত্ত হবি তখন তা বিশেষ সহায়তা করতে পারে। এর উত্তরে নরেন বললেন যে, তাঁর ঐ সকল প্রয়োজন নেই, আগে 'ঈশ্বর লাভ' হোক, তারপর ঐ সকল গ্রহণ করবার বিষয় চিন্তা করা যাবে। নরেনের কথায় ঠাকুর অত্যন্ত প্রীত হোলেন। এই জন্যই ঠাকুর নরেনকে বলতেন, ও খাপ খোলা তলোয়ার, খানদানী চাষা আর রাঙ্গা চোখো রুই। ঠাকুর নরেনকে বহু ভাবে শিক্ষা দিয়ে তাকে সর্ব দিক দিয়েই উন্নত করে দিয়েছেন। তিনি হাতে কলমে নরেনকে ধ্যান কিভাবে করতে হয়, কিভাবে সাধন করে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়—শিখিয়ে দিয়েছিলেন বলেই নরেন সর্ব বিষয়ে ছিলেন অপরাজেয়।

১৮৮৪ খৃঃ নরেন বি, এ, পাশ করবার পরই তাঁর জীবনে উপস্থিত হোল সাংঘাতিক এক বিপর্যয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম করবার ফলে নরেনের দানশীল ও স্নেহশীল পিতা হঠাৎ এক রাত্রিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হোয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন বলে মৃত্যুকালে স্ত্রী-পুত্রদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেন নাই, অধিকন্তু জ্ঞাতিকুল নানা রকমে শত্রুতা করতে আরম্ভ করে দিলেন। ঐ দিন নরেন বাড়িতে ছিলেন না, আনুমানিক রাত্রি ২টার সময় এই সাংঘাতিক সংবাদ পেয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে সৎকারাদির ব্যবস্থা করলেন। পিতার মৃত্যুর পরই নরেনের জীবনে উপস্থিত হলো দারুণ সঙ্কট। এত দুঃখের ভেতরও নরেন ঈশ্বরকে ভুলেন নাই—ধ্যান ধারণা রীতিমত করেই যাচ্ছেন। একদিন নরেন প্রাতঃকালে ভগবানের নাম কচ্ছেন শুনে মা ভুবনেশ্বরী বললেন, 'চুপ কর

ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে তো ভগবান ভগবান কল্লি—কি লাভ হোল ?'

নরেন স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—সত্যিই কি তবে ভগবান নেই ? এর পর থেকেই নরেন প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করতে লাগলেন —ঈশ্বর নেই, যদি থাকেন তবে তাঁকে ডাকবার সফলতা ও প্রয়োজন নেই।

চারিদিকে রব উঠলো নরেন নাস্তিক হয়েছে এবং নরেন দুশ্চরিত্র লোকের সাথে মেলামেশা করে—যথাতথা গমন করে ও মদ্য পান করে। বিভিন্ন লোক ও ভক্তমণ্ডলী নরেনের স্বরূপ দেখবার জন্য উপস্থিত হোতেন। তাদের নিকট নরেন পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদ উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিতেন, ঈশ্বর নেই। এইসব লোক দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঠাকুরের কাছে নানা ভাবে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতো। কেউ কেউ নরেনের তথাকথিত পতনের জন্য দরবিগলিত ধারায় তার বিপক্ষে অনেক কিছু বলায় ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলতেন—চুপ কর শালারা, মা বলেছেন—সে কখনও ঐরূপ হোতে পারে না, আর কখনও আমাকে ঐ কথা বললে তোদের মুখ দেখতে পারব না।

এর কিছু দিন পরেই নরেনের মনে পুনঃ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন উদয় হওয়ায় পিতামহের ন্যায় সংসার ত্যাগ করবার সংকল্প গ্রহণ করলেন কিন্তু রামকৃষ্ণ তাকে দক্ষিণেশ্বর নিয়ে এসে অশ্রুসজল চোখে বলতে লাগলেন, আমি জানি, তুমি মার কাজের জন্য এসেছ, সংসারে কখনও থাকতে পারবে না কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন সংসারে থাক। ঈশ্বরীয় কথায় ঠাকুর যেমন কাঁদছেন নরেনও তদ্রূপ তাঁর প্রবল ভাবরাশি চেপে না রাখতে পেরে কেঁদে অস্থির হোচ্ছেন।

হঠাৎ একদিন আলুথালু বেশে নরেন ঠাকুরের কাছে এসে বললেন—মাকে বলে আমাদের একটা ব্যবস্থা তোমায় করে দিতেই হবে। ঠাকুরের নির্দেশে নরেন মায়ের মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে

ধন রত্ন না চেয়ে চাইলেন বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি। এরূপ একবার নয়, তিন তিন বার নরেন মায়ের কাছে ঐগুলি চাইবার ফলে ঠাকুর নরেনকে বললেন—আচ্ছা যা, তোদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব আর কখনও হবে না। নরেন এখন বেশ বুঝতে পেরেছেন—ঠাকুর ইচ্ছা মাত্রেই সবকিছু করতে পারেন। এর পর থেকে নরেনদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হয় নাই। নরেনও শ্রীমর (মাষ্টার মহাশয়ের) চেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চাঁপাতলা স্কুলের শাখায় প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন, অবশ্য ঐ চাকুরী মাত্র তিন মাস করেছিলেন। ঠাকুরের সাংঘাতিক অসুখের সময় চাকুরী ছেড়ে অপর গুরুভাই ও ভক্তদের সাথে ঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ জনৈক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে এসে দেখলেন—নরেন প্রভৃতি ভক্তমণ্ডলী এবং গৃহী ভক্তরাও সেখানে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বৈষ্ণব ধর্মের সার 'তিনটি বিষয়' পালন করতে উপদেশ দিচ্ছেন। ঠাকুর বললেন—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন।' যেই নাম সেই ঈশ্বর, নামনামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সাথে জপ করবে। ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সর্বদা সাধু ভক্তদের শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে। কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করে 'সর্ব জীবে দয়া' প্রকাশ করবে। সর্ব জীবে 'দয়া' বলেই তিনি সমাধিস্থ হোলেন। কতক্ষণ পর অর্ধবাহ্য অবস্থায় পুনঃ বলতে লাগলেন—'জীবে দয়া' 'জীবে দয়া'—দূর শালা! কীটানুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না! না! জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা, সেবা নয়—পূজা।

রামকৃষ্ণের বাণী সকলেই শুনেছেন কিন্তু ভাবার্থ কেউ গ্রহণ করিতে পারে নাই এক নরেন ছাড়া। ঠাকুরের ভাব-সমাধি ভাঙবার পর নরেন বাইরে এসে বললেন—কি অদ্ভুত আলোই আজ ঠাকুরের

কৃপায় দেখতে পেলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলে প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সাথে সম্মিলিত করে কি সহজ, সরস ও মধুর আলোই প্রদর্শন করালেন ঠাকুর আজ। অনেকেরই ধারণা 'অদ্বৈত জ্ঞানলাভ' করতে হোলে সংসার ত্যাগ এমন কি লোকসঙ্গ সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করে বনে যেতে হবে, ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবগুলিকে হৃদয় হোতে সবলে উৎপাটিত করে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে, কিন্তু ঠাকুর ভাবমুখে যে কথা প্রকাশ করলেন তাতে বোঝা যায় যে, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে বেদান্তকে প্রয়োগ করা যায়। মানুষ যা কচ্ছে তা' করুক না কেন, কেবল এই ধারণা তার হওয়া চাই—"ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তার সম্মুখে প্রকাশিত রয়েছেন, জীবনের প্রতি মুহূর্তে যাদের সংস্পর্শে আসছেন, যাদের ভালবাসছেন, যাদের শ্রদ্ধা করছেন, সম্মান অথবা দয়া করছেন তারা সকলেই তাঁর (ঈশ্বরের) অংশ—তিনিই। সংসারের সকলকে 'শিব জ্ঞান' করতে পারলে ছোট বড় গণ্ডী, রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করবার অবকাশ কোথায়? 'শিব জ্ঞানে জীবের সেবা' রূপ কর্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। নরেন্দ্রনাথ এর পর জলদ-গম্ভীর নিনাদে বললেন—যদি ভগবান দিন দেন তবে আজ ঠাকুরের 'শ্রীমুখে যা শুনলাম' তা জগৎ মাঝে প্রচার করবই করব। এই বাণী পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবই।

নরেন ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পর শিবজ্ঞানে জীবের পূজা করে ঠাকুরের মহাবাক্য প্রতিপালন করেছিলেন। তাঁর পূজা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পেরিয়া সকলেই সমভাবে পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

গুরুর বাক্যকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তা শিখতে হয় নরেন অর্থাৎ বিবেকানন্দের কাছে। ঠাকুর বলতেন—গুরু মিলে লাখ, শিষ্য না মিলে এক। প্রকৃত শিষ্য নরেন তাই গুরুর আদর্শকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলে ধরে জীবের সেবায় নয়—'পূজায়' আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ঠাকুরের শরীর খারাপ। গলায় তীব্র ব্যথা, একটু উপশম হোলে সকলের পরামর্শে পানিহাটি উৎসবে গিয়ে রোগ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় ভক্তগণ ঠাকুরকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলেন। প্রথমে তাঁকে দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটে রাখা হ'ল। ওখানে আলো-হাওয়ার অভাবের জন্য ঠাকুর হেঁটে এলেন বলরাম বসুর বাড়ী, সেখানে কয়েকদিন থেকে শ্যামবাজার, সেখান থেকে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে বাড়ী ভাড়া করে ঠাকুরের চিকিৎসা করান হোল। বিখ্যাত আয়ুর্বেদাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রমুখ চিকিৎসকগণ ঠাকুরের অসুখকে রোহিণী রোগ (ক্যান্সার') বলে নির্ণয় করেন ও দুরারোগ্য বলে ব্যক্ত করায় বিখ্যাত হোমিও-প্যাথ্ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁর চিকিৎসা করেন, কিন্তু রোগ আরোগ্য না হোয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে মহেন্দ্রলালের ন্যায় দাম্ভিক বৈজ্ঞানিকও ঠাকুরের আশ্রিত হয়েছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলে-ছিলেন, এর মত ছেলে ধর্ম্মলাভ করতে এসেছে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। 'এ একটি রত্ন'—যাতে হাত দেবে তাতেই উন্নতি লাভ করবে। এর উত্তরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রসন্ন দৃষ্টিতে নরেনের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন, সেইরূপ ওঁর (নরেনের) জন্যই তো সব গো" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

যোগ ও বেদান্ত

(বৈদান্তিক কালী-সঙ্গে)

আর্যাবর্তের মুনিঋষিরা যুগযুগান্তর ধরে যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ইচ্ছাশক্তিকে এত উন্নত করতে পেরেছিলেন যে, ইচ্ছা মাত্রেই তাঁরা অঘটন ঘটাতে পারতেন, এমন কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘনঘটাকেও তাঁরা নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনতে সমর্থ হতেন। এগুলি পৌরাণিক নিছক গল্প বলে মনে হোলেও, অঘটন আজও ঘটে। বেশী দিনের কথা নয়, অভেদানন্দের জীবনে এরূপ ঘটনা অনেক দেখা গিয়েছে, তৈলঙ্গস্বামী, বিবেকানন্দ ও বামা ক্ষেপার জীবন-ইতিহাসেও এরূপ ঘটনা বিরল নয়। অতএব যোগবল জাগরিত হোলেই মানুষের ইচ্ছাশক্তি প্রবল রূপে বিকাশ ও প্রকাশ পায়। কিশোর কালীপ্রসাদের অন্তরেও তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিল যোগাভ্যাস শিক্ষা করবার জন্য। যেখানেই কোন যোগী পুরুষের সন্ধান পাচ্ছেন সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন কালী যোগ শিক্ষা করতে কিন্তু প্রকৃত গুরু তো আর গাছের ফল নয় যে, গাছে নাড়া দিলেই পাওয়া যাবে। যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই শুনছেন—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—দেখ অন্যপথ।

নিজে পথ না পেলে অপরকে কি কেউ পথের সন্ধান দিতে পারে? যার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "কাণা কাণাকে পথ দেখান," যারা নিজেরাই কাণা, যারা ঈশ্বর দর্শন তো দূরের কথা, ঈশ্বরের অনুভূতি পর্যন্ত লাভ করেন নাই তারা অপরকে কি পথ দেখাবে। এমন যে ভারতবিখ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যাঁকে তখন-কার লোকেরা রাজর্ষি জনকের সাথে তুলনা করতেন, তাঁকে যখন যুবক নরেন্দ্রনাথ কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেছেন কিনা? তিনি এক কথায় উত্তর শেষ

করলেন—'না'। এই নরেনই যখন আবার দক্ষিণেশ্বর এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা ?' নরেনকে ঠাকুর সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বললেন, "দেখেছি বৈকি ? আমি তোর সাথে যেমনটি কথাবার্তা বলছি, ঠিক সেইরূপ আমার মৃন্ময়ী মায়ের সাথেও কথা কই, মনের ব্যথা ও কথা তাঁকে জানাই। মৃন্ময়ী মা আমার চিন্ময়ী-রূপে আমার সাথে কথা বলেন, উপদেশ দেন।" কত বলিষ্ঠ কথা অথচ ভাষার মধ্যে কোন অলঙ্কার নেই, আছে সত্য প্রকাশের দৃঢ়তা। তাই রামকৃষ্ণ বলতেন "সত্যই" কলিযুগের তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলেই ভগবান লাভ হবে। অতি সরল কথা ও সরল পদ্ধতিই হোল রামকৃষ্ণের বিশেষত্ব। তাঁর অপর সরল কথা "যত মত তত পথ"। যত মত তত পথের মোহেই আজ পাশ্চাত্ত্য জগত ও অপরাপর দেশও মুগ্ধ বিমোহিত। জ্ঞানোন্মাদ, প্রেমোন্মাদ ও যোগোন্মাদ কালীপ্রসাদ রামকৃষ্ণের কথামৃত শুনবার জন্য ও তাঁর দর্শন স্পর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

কালীপ্রসাদ শিশু বেলা থেকেই পুরাণের গল্প পড়তে ও শুনতে ভালবাসতেন। তাঁর বেশী পছন্দ ছিল অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ঋষি শঙ্করাচার্যের পুস্তকাদি এবং তাঁর কার্যাবলী। শঙ্করাচার্যের কার্যাবলী তাঁর অন্তরে রেখাপাত করেছিল বলেই ১৮৮৩ খ্রীঃ হোতে হিন্দু-দার্শনিক শশধর তর্কচূড়ামণির ষড়দর্শন সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক বক্তৃতা—কালীপ্রসাদ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন এবং এই বক্তৃতাবলীর মধ্যে পাতঞ্জলীর যোগশাস্ত্র তাঁকে বেশী অভিভূত করে।

শশধর পণ্ডিতের বক্তৃতা শ্রবণ করে যোগ শিক্ষা করবার জন্য কালীপ্রসাদ উন্মাদের ন্যায় গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন, এমন কি শশধর পণ্ডিতের নিকটেও যোগ শিক্ষা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তিনি সময়ের অভাবের জন্য প্রত্যাখ্যান করলেন। কালীবর

বেদান্তবাগীশও বললেন, তাঁরও সময় নেই তবে সে যদি স্নান করবার পূর্বে তেল মালিশের সময় আসে তবে মুখে মুখে যোগসূত্রের কতকাংশ শেখাতে পারেন। চিন্তাশীল, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী কালীপ্রসাদ বুঝতে পারলেন—উপযুক্ত গুরু ছাড়া বই পড়ে ও বইএর পাঠ নিলে যোগ শিক্ষা হয় না বা হোতে পারে না। এরজন্য চাই প্রকৃত সদ্‌গুরু যাঁর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আছে নখদর্পণে। এরই জন্য রামকৃষ্ণ বলতেন, গুরু মেলে লাখ শিষ্য না মেলে এক। কালীপ্রসাদের ভার নিতে পারেন এমন গুরু কি যেখানে সেখানে পাওয়া যায়?

এদিকে রামকৃষ্ণ লীলা প্রকাশের জন্য এবং যত মত তত পথের বাণী প্রচারের জন্য তাঁর চাই ত্যাগী সন্তান, তাই ঠাকুর কেঁদে কেঁদে বলতেন, কোথায় তোরা সব বীর (সৈনিক) সন্ন্যাসী, আয় তোরা, যাদের ধীরতার মধ্যে আছে বেগ, জড়তার মধ্যে বল, ভীরুতার মধ্যে বীর্য, তোরা চলে আয় বন জঙ্গল ভেদ করে, নদী-নালা সাঁতরে, চলে আয় বায়ুবেগে। ওদিকে আবার ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সুলভ সমাচার ও সানডে মিররে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভগবৎভক্তি, যোগ সাধন ও সমাধির কথা প্রকাশিত হওয়ায় বাঙলার জ্ঞানী গুণী ও তরুণ বঙ্গের তরুণরা দলে দলে আসতে লাগলেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য ও তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনবার জন্য। কালীপ্রসাদের বন্ধু যজ্ঞেশ্বর তাঁকে বললেন—দক্ষিণেশ্বরে একজন মহাযোগী পুরুষ আছেন রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে খ্যাত, তাঁর কাছে গিয়ে যোগাভ্যাস শিক্ষা করে এস। তিনিই পারবেন তোমায় যোগশিক্ষা দিতে।

যোগলোভাতুর কালীপ্রসাদ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নানা পথ ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বর কিন্তু সংবাদ পেলেন—তিনি চলে গেছেন কলকাতায়, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। ক্লান্ত অবসন্ন কালীর দৈবক্রমে দেখা হল শশীর সাথে, শশী আরও কয়েকবার এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সুতরাং তাঁর এখানকার কিছু কিছু নিয়ম জানা আছে। উভয়ে গঙ্গায় স্নান করে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে ঠাকুরের

জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর গাড়ীর শব্দ কানে এল। কালী দেখতে পেলেন একখানা স্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী তাদের দিকে আসছে। নামলেন ঠাকুর গাড়ী থেকে, লাটুও (লাটুমহারাজ) ঠাকুরের পেছন পেছন এলেন ঠাকুরের ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে রামলাল (রামলাল দাদা) কালীকে নিয়ে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হোলেন। ঠাকুরকে আভূমি প্রণাম করলেন কালী। তীক্ষ্ণভাবে কালীপ্রসাদকে দেখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমার কাছে কি চাও?" কালী বিনীত স্পষ্ট ভাবে উত্তর দিলেন, যোগ দর্শন শিখতে চায় সে—অবশ্য ঠাকুর যদি কৃপা করে তাকে শিক্ষা দেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কালীর অল্পবয়স দেখে বললেন, এই বয়সে যোগ শিখবার ইচ্ছা হয়েছে? তা বেশ! এ অতি ভাল লক্ষণ। তারপর বললেন, "দেখছি তুই পূর্ব জন্মে একজন বড় যোগী ছিলি।" তিনি অভয় দিয়ে বললেন "আচ্ছা আমি তোকে যোগাসনের উপায় শিখাব, আজ বিশ্রাম কর, কাল প্রাতে আসিস। আজ কালীপ্রসাদের ভার নিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বয়ং।

এই কালী তার মা বাবার অন্তরের ধন। এই কালীকে মা কালীর পায়ে মানত করে রসিক মাষ্টার ও তাঁর স্ত্রী নয়নতারা পেয়েছিলেন বলেই তার নাম রাখা হয়েছিল কালীপ্রসাদ, সেই কালী আজ রামকৃষ্ণের একজন পার্ষদ ও সন্তান। কালী যখন মা, বাবা, বাড়ীঘরের মায়া ত্যাগ করে কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে রামকৃষ্ণের কঠিন রোগের সময় তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করে সেখানেই দিনাতিপাত করতেন, বাবা মায়ের অনুরোধ উপরোধেও কিছুতে বাড়ী যেতেন না—তখন পিতা রসিকচন্দ্র ঠাকুরের কাছে গিয়ে পুত্রকে ভিক্ষা চাইলেন। রামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তোমার ছেলে যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে ও আসবে। তাকে আমি খেয়ে ফেলেছি। সে আর এখন তোমার ছেলে নয়, সে এখন আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ।" ঠাকুরের এই 'খেয়ে ফেলা' সম্বন্ধে কালীপ্রসাদ

অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। যে কবিতাটি তাঁর দেহরক্ষার পর তাঁর রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।

কবিতাটি এইরূপ—

তুমি যে কৃপা করেছ প্রভো,
তাহা কি আমি ভুলতে পারি,
তুমি যেমন খেয়েছ আমায়,
এ রহস্য বুঝিবে কেবা
তাহা আমি বলতে নারি।
তোমার আদেশে এ রহস্য
প্রকাশ আমি করতে নারি।
তুমি আমি এক হয়েছি—
তুমি আমি ভিন্ন নহি।

কালীপ্রসাদ চেয়েছিলেন যোগ শিখতে, এক কথায় রামকৃষ্ণ সম্মত হোলেন যোগ শিক্ষা দিতে, অথচ এই যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হোলে বহুযুগ ধরে তপস্যার প্রয়োজন হয় আর ঠাকুরের কাছে চাইবা মাত্র তিনি কঠোর যোগশাস্ত্র শিক্ষা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আগামীকল্য ব্রাহ্ম মুহূর্তে কালীপ্রসাদ লাভ করবে তাঁর দীর্ঘদিনের কামনার ধন।

পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে কালী প্রাতকৃত্যাদি সম্পন্ন করে অপেক্ষা করছেন—কখন ঠাকুরের কাছ থেকে আসবে 'ডাক'। এসেছে ডাক। দয়াল ঠাকুর রামলালকে পাঠালেন কালীকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য, ঠাকুরও তাঁর পরম ভক্ত কালীপ্রসাদের জন্য উত্তরের দিকের বারান্দায় তক্তাপোসের উপর বসে আছেন। ঠাকুর প্রশ্ন করে জানলেন—কালী বিয়ে করেনি এবং এত অল্প বয়সেই রঘুবংশম্, ভগবদ্গীতা, শিবসংহিতা, পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। কালীর মুখে এই সংবাদ শুনে ঠাকুর খুশিমনে

মন্তব্য করলেন, বিয়ে আর করিসনি। কালী পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসীর আদর্শ রক্ষা করেই স্বামী অভেদানন্দ নাম গ্রহণ করে মহাব্রত পালন করে যান।

ঠাকুর কালীকে তাঁর তক্তাপোষের উপর বসতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "তোর জিহ্বা বার কর।"

কালীপ্রসাদ জিহ্বা বের করা মাত্র ঠাকুর তাঁর ডান হাতের মধ্যমা দ্বারা জিহ্বায় মূল মন্ত্র লিখে দিলেন। এবং পরক্ষণেই তাঁর ডান হাতখানা কালীর বুকের উপর স্থাপন করে বললেন, "মা কালীর ধ্যান কর!"

অল্প সময়ের মধ্যেই কালী ধ্যানমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হোলেন। ঠাকুর এই শক্তিমন্ত্র প্রদান করে সন্তানদের অন্তরের মধ্যে শক্তি সঞ্চালন করতেন বলেই তিনি তাঁর সন্তানদের বলতেন, "তোরা সব সময় আমার কাছে চুপ করে বসে থাকবি, আর তোদের কিছু করতে হবে না। তোদের উগ্র তপস্যার প্রয়োজন নেই, আমার কাছে বসে থাকলেই চলবে।"

শ্রীমা কালীকে বলেছিলেন, "কালীর জিহ্বাগ্রে মা সরস্বতী সর্বদা বসে থাকবেন।"

ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, ওর মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ আছে।

নরেনের কথা আলাদা, নরেন ছিলেন মহাশক্তিধর কিন্তু কালী-প্রসাদও বড় কম যেতেন না। ঠাকুর ও শ্রীমার আশীর্বাদে কালী নরেনের অসমাপ্ত কার্য সুসম্পন্ন করে পৃথিবীখ্যাত বৈদান্তিকরূপে খ্যাত হোতে পেরেছিলেন। ঠাকুর অভেদ মন্ত্রে কালীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন বলেই সন্ন্যাস নেবার সময় বিবেকানন্দ তাঁকে অভেদানন্দ নাম প্রদান করেন। অভেদ মন্ত্র যিনি লাভ করেন তাঁর দিনরাত্রি ভেদ থাকে না, কিন্তু যদি কখনও ভেদ উপস্থিত হয় তবে সে আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করবে। সে ভগবানের আলো কোন দিনও

দেখতে পাবে না, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যেই তাঁর গতি হবে। সে সাধকের মধ্যে 'সব দেবদেবী এক ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি', এই অভেদ ভাব দেখা যায়, সত্যের ভগবানকে সে-ই শুধু পায়। তাই ঠাকুর তাঁর সন্তানকে শেখালেন অভেদমন্ত্র। এইমন্ত্র একবার লাভ করলে তার অশুচিকে শুচি করতে আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

কালীপ্রসাদ অত্যন্ত অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন, ধ্যানজপ করে যে সময় পেতেন সেই সময় তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন, যার জন্য ঠাকুর কাশীপুর বাগানে বসে কালীকে বলেছিলেন, "তুই তো ছেলেদের মধ্যে বই পড়া ঢুকালি।" তার পর একদিন ঠাকুর কালীর অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা দেখে বললেন, "নরেনের পরেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাতে পারে তেমনি তুইও পারবি।" সত্য সত্যই নরেনের অসমাপ্ত কার্য কালীই সমাধা করতে পেরেছিলেন।

শীতকাল, অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছে, কাশীপুর বাগান বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধুনি জ্বেলে ধ্যান ধারণা করছেন। নরেন, কালী, রাখাল, শশী, শরৎ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কোন কোন দিন বেদান্তের বিচার, গীতা পাঠ, শঙ্করাচার্য্যের মোহ-মুদগর পাঠ, যোগাবশিষ্ট পাঠ করতেন। নরেনের ছায়া রূপে কালীপ্রসাদ সর্বদাই তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন এবং সকল বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন, অবশ্য সংঘনায়কের নির্দেশ সকলেই নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতেন।

ঠাকুরের সন্তানবৃন্দ ব্রহ্মের সাধনা করেছেন; ব্রহ্মজ্ঞান হোলে পর খাদ্যাখাদ্য বিচার লোপ পেয়ে তথায় জাগরিত হয় চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান। একদিন নরেন্দ্রনাথ 'এরূপ ভাব' তাঁদের উদয় হোয়েছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য গুরুভাইদের বললেন, 'চল, আজ তোদের আহারের কুসংস্কার ভেঙ্গে দেই।' কালী, তারক, শরৎ, যোগেন ও নিরঞ্জন এলেন নরেনের সাথে বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এক মুসলমানের হোটেলে। সেখানে মুর্গীর ডালনা একটু একটু আহার করে তাঁদের বহুদিনের কুসংস্কার ভেঙ্গে দিলেন। ঐদিন রাত্রি ১০টায় কালী-

প্রসাদ ঠাকুরের ঘরে এসেছেন তাঁকে সেবা করতে কারণ ঐদিন তাঁর সেবার পালা ছিল। ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোরা কোথায় গিয়েছিলি ? কালীপ্রসাদের কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ঠাকুর পরমানন্দে বললেন, "সংস্কার ভেঙেছিস তা বেশ করেছিস।"

নরেনকে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, "শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে ধন্য আর হবিষ্যি করে যদি কাম-কাঞ্চনে মন থাকে তাহলে তাকে ধিক্।" এই বিভেদ দূর করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সকলের মন জয় করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ বিনা রক্তপাতে আফ্রিকাবাদে সমস্ত পৃথিবী জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ঠাকুর বলতেন, 'যত মত তত পথ', সুতরাং সকলের মন তো আর এক রকম নয়, ঈশ্বরলাভের পথও সকলের জন্য সমান নয় বা সমান হোতে পারে না। এজন্যই তিনি বলতেন, 'যার যেমন সয়'—তাই তিনি আধার বুঝে সেইরূপ শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন—নরেন ও কালীপ্রসাদ লোকমান্য হবে, অতএব এই দুজন-কেই তিনি ধ্যান ধারণা সমাধির সাথে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রের সাথে পৃথিবীর অপরাপর বিষয়ের পুস্তকাদি পাঠ ও বিচার সমর্থন করতেন।

স্বামী অভেদানন্দ

কালী ও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সর্বধর্ম সমন্বয় জ্ঞান

(বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কেশব সেনের সঙ্গে)

ঠাকুর বলতেন, ওরে মানীকে মান না দিলে ভগবান রুষ্ট হন। শ্রীভগবানের শক্তিতেই তো তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন, তাদের অবজ্ঞা করলে তাঁকে (শ্রীভগবানকে) অবজ্ঞা করা হয়। তাই রামকৃষ্ণ মানীর মান রক্ষা সর্বদাই করতেন। যেখানেই তিনি কোন জ্ঞানী গুণীর সন্ধান পেতেন, অমনি তাঁকে যে কোন উপায়েই হোক না কেন দর্শন করতে ব্যস্ত হতেন। তারপর যদি তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হতেন তবে তো কোন কথাই ছিল না, তা না হলে রামকৃষ্ণ স্বয়ং তার নিকট অনাহূত হয়েও উপস্থিত হতেন। কেবল উপস্থিত হয়েই বা আলাপ করেই কাজ শেষ করতেন না, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে, তারপর আলাপ জমাতেন। এরূপ ভাবে তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ভক্তপ্রবর কেশব সেন, বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, কাশীধামের প্রসিদ্ধ বীণকার মহেশ, শ্রীবৃন্দাবনের সখীভাবে ভাবিতা গঙ্গামাতা, কালনার অশীতি বছরের অধিক বয়ঃক্রম ভগবান দাস বাবাজী, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতির সাথে এবং আরও অনেকের সাথে দেখা করেছেন। কখনও তিনি অনাহূত ভাবে গিয়েছেন আবার কখন সংবাদ দিয়েও যেতেন।

ঠাকুর এসেছেন বেলঘরিয়া জয়রাম সেনের বাগান-বাড়ীতে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সাথে দেখা করতে—সঙ্গে ভাগিনেয় হৃদয়রাম। কেশব সেন কলুটোলার জমিদার, বৈষ্ণব সেন পরিবারের সন্তান, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্মী। যাঁর বক্তৃতা প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, যে কেশব ব্রাহ্ম

ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যে কেশবের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙলার তখনকার শিক্ষিত তরুণের দল ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছে, যে কেশবকে তখনকার শিক্ষিত সমাজ উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যে কেশবকে ব্রাহ্মদের একাংশ অবতাররূপে জ্ঞান করতো—সেই কেশবের কাছে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এই সেই বিদ্রোহী বীরভক্ত কেশব—যার সমস্ত ধর্মসাধনার মূলধারা হচ্ছেন তাঁর মা সারদাসুন্দরী। কেশব প্রাচীন ধর্ম-কর্ম মানছেন না, মা ছাড়া বাড়ীর আর সবাই কেশবের উপর ঘোরতর বিরক্ত, পারে তো ছিঁড়ে খায়, কিন্তু সারদাসুন্দরী নিজের দুঃখকে ছেলের সত্যের চাইতে বড় করে দেখতে পেলেন না। ছেলে যদি সত্যভ্রষ্ট হয় সে দুঃখ যে দ্বিগুণ হয়ে বাজবে তাঁর বুকে। অভিভাবকেরা ঠিক করেছেন—কুল-গুরুর মন্ত্র কেশবকে দিতে হবে। সব ঠিক, দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে, মা সমস্ত উপকরণের ডালা সাজিয়ে বসে আছেন; কুলগুরু এবং সমস্ত অভ্যাগত উপস্থিত কিন্তু কোথায় কেশব? যাকে উপলক্ষ্য করে এই আয়োজন সেই কেশব সমস্ত ফেলে চলে এসেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ী, সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন—পৌত্তলিক গুরুমন্ত্র তিনি গ্রহণ করবেন না।

ঠাকুর বলতেন—রোখ চাই, রোখ না হলে কোন কাজ হয় না। কেশবও রোখ করে বাড়ীর সংশ্রব ত্যাগ করে এসেছেন, এমন কি স্ত্রীকে পর্যন্ত প্রত্যেকের মতের বিরুদ্ধে পাল্কি করে দেবেন-ঠাকুরের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। তখনকার দিনে বৌকে নিয়ে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল কিন্তু কেশব তথায় হানলেন কঠোর আঘাত। মা সারদাসুন্দরীকে ব্রাহ্ম সমাজের কতগুলি বই পড়তে দিয়ে গেলেন, মা গুরুঠাকুরকে ঐগুলি দেখালেন। গুরুঠাকুর ঐগুলি পড়ে মত প্রকাশ করলেন, 'এ তো খুব ভাল ধর্ম। তুমি ভেব না মা, তোমার কেশব যে পথ ধরেছে তাতেই তার মঙ্গল হবে।'

বৈষ্ণব বংশে জন্ম কেশবের, শিশুবেলা থেকেই দেখে এসেছেন খোল করতাল বাজিয়ে ভজন কীর্তন। নিজেও শিশুবেলা খোল বাজিয়ে 'হরি হরি' বলে নেচে নেচে কীর্তন করেছেন, ব্রাহ্ম সমাজেও তাই খোল করতাল ঢোকালেন কেশব। এজন্য নিন্দা, কুৎসা সহ্য করতে হয়েছে কেশবকে কিন্তু কেশব দেশের ধর্ম-প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম ঠিক বুঝতে পেরেছেন ব'লেই হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করেছেন ব্রাহ্ম সমাজে। কীর্তন-রসে কঠোর ব্রাহ্মধর্মকেও রসসিঞ্চিত করছেন। কীর্তন-রসে উন্মত্ত হয়ে নিজে কেঁদেছেন, সকলকে কাঁদিয়েছেন, সকলকে হাসিয়েছেন—নিজেও হেসেছেন; জনগণকে মাতিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর-নেশায় বিভোর হয়ে। সেই কেশবের নিকট ঠাকুর এসেছেন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ।

ঠাকুর ভাবাবেশে কেশবের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কেশব তখন ব্রাহ্ম ভক্ত ও চেলাদের সাথে ঈশ্বরীয় আলোচনায় রত। কেশবকে দেখেই পরমহংস রামকৃষ্ণ বলছেন, "এরই ল্যাজ্ খসে পড়েছে।" এ কথা শুনে ব্রাহ্ম ভক্তেরা উপহাস করে উঠল, কিন্তু এক অপরিচিত দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন সৌম্যমূর্তিমান পুরুষের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যে গূঢ় তথ্য লুক্কাইত আছে মনে করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্যদের নীরব হ'তে বলে কেশব এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করায় ঠাকুর বল্‌ছেন—"বেঙাচির ল্যাজ্ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে জলেই থাকে, ডাঙ্গায় উঠতে পারে না, উঠলে জীবিত থাকে না। বেঙাচির ল্যাজ্ খসে গেলেই তখন সে শক্তিমন্ত, লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে। ল্যাজ্ খসে গেলে জলে স্থলে দুই ঠাঁই সে থাকতে পারে। সংসারের লোক সেইরূপ বেঙাচির ল্যাজ্‌রূপ 'মায়া জালে' আবদ্ধ আছে অর্থাৎ মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ্ না খসে ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে, অবিদ্যার ল্যাজ্ খসলে—জ্ঞান হ'লে তবেই মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে সংসারেও থাকতে পারে।"

বিরাট পণ্ডিত কেশব সেন ঠাকুরের একটিমাত্র কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মূক হয়ে গেলেন। কেশবের ন্যায় ব্যক্তি যাঁর মুখ থেকে ভাষার ফুলঝুরি উড়ে যায়, যিনি পাণ্ডিত্যের গরবে গরীয়ান, সেই কেশব নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁর বিদ্যার ও বক্তৃতার জৌলুষ ম্লান হয়ে গেল। ঠাকুরের রূপদর্শনে ও কথার মাধুর্যে কেশবের ন্যায় লোকও মুগ্ধ, বিমোহিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবার দরিদ্রের গৃহে এবং নিরক্ষর অবস্থায়। পূর্ব পূর্ব যুগে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন রাজার সন্তান—শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় ছিলেন তাঁরা পারদর্শী, অঢেল ছিল তাঁদের ঐশ্বর্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ ছিলেন রাজপুত্র, তাঁরা ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং প্রচারকার্যের জন্য ছিল তাঁদের লোকবল ও অর্থবল। আজ হতে ৫০০ শত বৎসর পূর্বে যুগ-প্রয়োজনে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য—যার প্রভাবে তিনি অঘটন ঘটিয়ে ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্যও বিরাট শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। কিন্তু এবার যিনি শ্রীরামকৃষ্ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি নিরক্ষর, তাঁর আবাসস্থল ছিল দরিদ্র নিরন্ন নিম্নজাত-পরিবেষ্টিত গ্রামাঞ্চলে, দরিদ্র গৃহে। যেথায় বসে তিনি দরিদ্র ও নিম্নজাতের (মানবের) নগ্নরূপ দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেখানে বসে তিনি নিরন্নের মর্মবেদনা উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছিলেন এবং যেখানে বসে তিনি মনে ভাবতে পেরেছিলেন—সর্বধর্মের সমন্বয়ের কথা। সর্বধর্মের সার গ্রহণের কথাও হয়তোবা তিনি এখানে (পৈত্রিক-ভবনে) বসেই চিন্তা করেছিলেন। নিরক্ষর হোয়েও সাধনবলে ও সত্যনিষ্ঠাপ্রভাবে তিনি সর্বশাস্ত্রের সার গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—তাইনা-তিনি বলতে পেরেছিলেন, "তোরা গাদা গাদা বই পড়িস আর আমি সারটুকু গ্রহণ করি।" তাই-না তিনি বলতে পেরেছিলেন, "যত মত তত পথ," তাই-না তিনি সর্বধর্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করে বলতে পেরেছিলেন, "ভগবানের আরাধনায় কোন জাতের বালাই নাই", তাই-না তিনি হলধারীকে বলতে পেরেছিলেন, আমি মুক্‌খু হলে কি হবে আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি তো আর মুক্‌খু নন।"

সেই মৃন্ময়ী মূর্তিকে চিন্ময়ী করে নিয়ে তার উপদেশ মত কথা কইতেন বলেই সর্বশাস্ত্র ও শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যগুলি ঠাকুরের নিকট ছিল সহজ ও সরল। প্রয়োজনবোধে মা ভবতারিণীর প্রত্যাদেশ মত কাজও তিনি করতেন বলেই তরুণ নরেনের মধ্যে আঠারটা শক্তির বিকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। মায়ের মুখনিঃসৃত বাণী-প্রভাবেই তিনি কেশব, নরেন, বিজয় প্রভৃতি চিন্তাশীল তার্কিকদের স্বমতে আনতে পেরেছিলেন। এই শক্তি-প্রভাবেই ঠাকুর বলতে পেরেছিলেন— কেশব, বিজয়ের মধ্যে দেখলাম এক একটি বাতি শিখার মত (জ্ঞানের) জ্বলছে আর নরেনের মধ্যে জ্ঞান-সূর্য রয়েছে। নরেন তখন কলেজের ছাত্র, যুবক মাত্র। কে তাকে চেনে? আর কেশব দিক্‌বিজয়ী পণ্ডিত যার হাজার হাজার শিষ্য, যার নাম খ্যাতি সাগরপার পর্যন্ত বিস্তৃত। বিজয় ব্রাহ্ম-মন্দিরের বিখ্যাত আচার্য হিসাবে বাঙলার তরুণদের নিকট খ্যাত। এই কেশবকেই একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় দেখেছিলেন একটি ময়ূররূপে। ময়ূরটির মস্তক মণি-শোভিত এবং পেখম বিস্তার করে রয়েছে। ব্যাখ্যা করলেন ঠাকুর, মুক্ত পেখমটি কেশবের অনুসরণকারীবৃন্দের প্রতীক এবং মণিখণ্ডটি তার রাজসিক মনোভাবের পরিচায়ক। রামকৃষ্ণের এই ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল, কারণ কেশব পরবর্তী কালে সাধনমার্গে বিজয়ের ন্যায় উচ্চস্থান অধিকার করতে পারেন নাই, রাজসিক ভাবাপন্ন অবস্থায়ই জীবনপাত করেছিলেন, দল করাটাই তাঁর উচ্চে আরোহণের প্রতিবন্ধক ছিল বলেই ধারণা করা চলে।

এর পর থেকেই কেশব ও তাঁর ভক্তবৃন্দ দক্ষিণেশ্বর আসা-

যাওয়া করতে লাগলেন, আবার ঠাকুরও কেশবের বাড়ী—না হয় ব্রাহ্ম-মন্দিরে যাচ্ছেন।

১৮৮২ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন কেশব একখানা জাহাজ নিয়ে এসেছেন, ঠাকুরকে নিয়ে গঙ্গায় ভ্রমণ করবেন বলে এবং রামকৃষ্ণের মুখ থেকে ঈশ্বরীয় কথা শুনবেন বলে। ঐদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কেশব-বিজয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে—কেশবের মেয়ের বিয়ের পর থেকেই। তত্রাচ ঠাকুর বিজয়কে তাঁর সাথে জাহাজে যেতে বলছেন। রামকৃষ্ণ বিজয়কে নিয়ে বৈকাল ৪টায় রওনা হলেন জাহাজে। নৌকায় উঠেই ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। মাষ্টারও এসেছেন কেশবের জাহাজে; তিনি দাঁড়িয়ে ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দেখছিলেন। তিনি এসেছেন পরমহংস রামকৃষ্ণ ও কেশবের মিলন দেখবার জন্য ও উভয়ের ঈশ্বরীয় কথাবার্তা শুনবার জন্য। মাষ্টারও অপরাপর শিক্ষিত তরুণদের ন্যায় কেশবের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বক্তৃতাদি দিবার শক্তির জন্য তাঁকে মান্য করতেন। কেশব হিন্দুর দেবদেবী পূজাকে অনেকবার পৌত্তলিকতা বলে ব্যক্ত করছেন অথচ তিনি এসেছেন রামকৃষ্ণের কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনতে এবং রামকৃষ্ণকে নিয়ে জাহাজে ভ্রমণ করতে। ব্রাহ্মআচার্য কেশব পৌত্তলিক রামকৃষ্ণকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন আবার মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দ নিয়ে আসেনও দক্ষিণেশ্বর—এটা অনেকের নিকটই বিস্ময়কর ব্যাপার এবং এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য অনেকে উদ্‌গ্রীবও ছিল। রামকৃষ্ণ নিরাকারবাদীও বটেন আবার সাকার বাদীও। ব্রহ্মের চিন্তা করেন—আবার দেবদেবীর মূর্তির সম্মুখে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করেন—প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্যগীত করেন, খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতা পরেন কিন্তু সংসার করেন না, ভাব সমস্ত সন্ন্যাসীর, তাই লোকে পরমহংস বলে। এদিকে কেশব নিরাকারবাদী, স্ত্রীপুত্র লয়ে সংসার করেন, ইংরাজীতে লেকচার দেন,

সংবাদপত্রে লেখেন ও বিষয়কর্ম করেন। ঠাকুরের নৌকা এসে জাহাজে লাগল, তখনও তিনি সমাধিস্থ। ভক্তবৃন্দ তাঁদের চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন—নৌকা করে আসছেন একটি মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম ; এরূপ দর্শন মানুষের অদৃষ্টে সর্বদা ঘটে না—এরূপ স্থলে সমাধিস্থ মহাপুরুষের উপর কার না ভক্তির উদ্রেক হয় বা কোন পাষাণ হৃদয় না বিগলিত হয় ? সকলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য ব্যস্ত। তাঁকে নিরাপদে নামাবার জন্য কেশব শশব্যস্ত হলেন। অনেক কষ্টে হুঁস করান গেল, এখনও ভাবস্থ, একজন ভক্তের উপর ভর দিয়ে ঠাকুর আসছেন, পা নড়ছে মাত্র। কেবিন-ঘরে নিয়ে আসা হল। কেশবাদি ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, একখানা চেয়ারে ঠাকুরকে বসান হল, কেশব বিজয়ও বসলেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর আবার সমাধিস্থ।

কিছুক্ষণ পর ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হোল। তখন ঠাকুর অস্পষ্ট-স্বরে বলছেন, মা, আমায় এখানে আনলি কেন ? আমি কি এদের বেড়ার ভেতর থেকে রক্ষা করতে পারব ?

ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে, তখন গাজীপুরের নীলমাধব বাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত পাওহারি বাবার কথা পাড়লেন। একজন ব্রাহ্মভক্ত বললেন, পাওহারি বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মত একজন। ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করলেন। ব্রাহ্মভক্তটি পুনঃ বললেন—পাওহারি বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ্ রেখে দিয়েছেন। ঠাকুর এখনও ভাবমুখে আছেন। তিনি ঈষৎ হেসে নিজের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, "খোলটা।" 'বালিস ও তার খোল' দেহী ও দেহ। ঠাকুর বলেছেন—দেহ নশ্বর, থাকবে না। দেহের ভেতর যিনি দেহী তিনিই অবিনাশী, অতএব দেহের ফটোগ্রাফ্ লয়ে কি হবে ? দেহ অনিত্য—এর আদর করে কি হবে ? বরং যে ভগবান অন্তর্যামী মানুষের মধ্যে বিরাজ করছেন তাঁরই পূজা করা উচিত।

ঠাকুর প্রকৃতস্থ হয়ে বলছেন, তবে একটি কথা আছে, ভক্তের হৃদয় তাঁর-আবাস স্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষভাবে আছেন। জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলেন আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলেন। একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে তখন তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনে বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম এ নয়, জীব নয়, জগৎ নয়; বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না, তিনি যে ব্যক্তি, তাও বলবার যো নাই। ভক্তেরা বলেন—এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে, হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, জীবজন্তু এ সব ঈশ্বর করেছেন, তাঁরই ঐশ্বর্য। ভক্তের সাধ—সে চিনি খায় কিন্তু চিনি হতে ভালবাসে না।

তারপরই বলেছেন—ভক্তের ভাব কি জান? হে ভগবান! তুমি প্রভু—আমি তোমার দাস, তুমি 'মা' আমি তোমার সন্তান, আবার তুমি আমার 'সন্তান', আমি তোমার মাতাপিতা, তুমি 'পূর্ণ' আমি তোমার অংশ; ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করে না যে আমি 'ব্রহ্ম।' যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে, স্থির আসনে, অনন্য মন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে। কিন্তু একই বস্তু, নাম-ভেদ মাত্র। যিনি **ব্রহ্ম** তিনিই **আত্মা**, তিনিই **ভগবান**। ব্রহ্মজ্ঞানীর **ব্রহ্ম**, যোগীর **পরমাত্মা** আর ভক্তের **ভগবান একই**।

ব্রাহ্মভক্তেরা রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত কথা শুনে মুগ্ধ, হতবাক্। গঙ্গার সেই তরঙ্গায়িত কলকল্লোলধ্বনি তাদের কর্ণে পৌঁছল

না, তাঁরা মৌন মূক হয়ে শুনছেন কথামৃত আর দর্শন করছেন সেই সহাস্য বদন, আনন্দময় প্রেমানুরঞ্জিত নয়ন, প্রিয়দর্শন অদ্ভুত এক যোগী পুরুষকে যিনি সর্বত্যাগী প্রেমিক বৈরাগী, যিনি ঈশ্বর বই কিছু জানেন না এবং যিনি ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলেন না।

বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীবজগৎ, এসব শক্তির খেলা। আবার তাঁরা বলছেন, বিচার করতে গেলে এসব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানতে হলে আর একটিকে মানতে হয়। তারপরই তিনি একটি অপূর্ব উপমা দিলেন— "যেমন দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না, সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মিকে ভাবা যায় না আবার সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। তেমনি ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে এবং শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি সর্বকার্য করছেন তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নামরূপ ভেদ।" তারপরই রামকৃষ্ণ চমৎকার উপমা দিলেন, যাকে বলা যায়—উপমা রামকৃষ্ণস্য!—"যেমন জল, water, পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট। হিন্দুরা জল খায় তারা বলে জল, এক ঘাটে মুসলমান জল খায় তারা বলে পানি আর এক ঘাটে

ইংরাজেরা জল খায় তারা বলে water। তিনি 'এক' কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে God, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা প্রভৃতি।"

অন্যত্র ঠাকুর ভগবান এক ও বহু নামের এমন একটি সহজ ও সরল উপমা দিয়েছেন যা প্রত্যেকের পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সহজ। ঠাকুরের কথাগুলি রসাত্মক হলেও উহা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অর্থবাচক। তিনি বলেন—"যেমন একব্যক্তি কারো পিতা, কারোর জ্যেঠা, কারো খুড়ো, কারো মেসো, কারো ভগ্নীপতি, কারোর শ্বশুর ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও সম্বন্ধ ভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে, তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা করে থাকে। যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ হয়— অর্থাৎ যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য কামনা করে সে তাই পেয়ে থাকে।"

কেশব সহাস্যে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কালী কত ভাবে লীলা করেছেন—সেই কথাগুলি বলুন?

ঠাকুরও হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, তিনি নানাভাবেই লীলা করেছেন। তিনিই **মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী**। মহাকালী ও নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী যখন ছিল না, ছিল নিবিড় আঁধার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল স্বভাব, বরাভয়দায়িনী, গৃহস্থ বাটিতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়, রক্ষাকালীর পূজা করতে হয়। শ্মশানকালী সংহারমূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী-বেষ্টিত শ্মশানের মধ্যে থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমর বন্ধ। যখন জগৎনাশ

হয় তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। এর পর একটি অপূর্ব উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ,—"গিন্নির কাছে একটি ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকমের জিনিস তুলে রাখেন। হ্যাঁগো! গিন্নীদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে—ভেতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুটলি-বাঁধা শশাবীচি, কুমড়োবীচি, লাউবীচি এই সব রাখে, আবার দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ীও সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর **আত্মাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন।**"

'কালী কি কালো? দূরে—তাই কালো, জানতে পারলে—কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীল বর্ণ—কাছে গিয়ে দেখো কোন রং নাই, সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল—কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো, রং নাই।' এর পরই ঠাকুর গান ধরলেন, 'মা কি আমার কালো রে!'

গান শেষ করে বলছেন, বন্ধন আর মুক্তি, দুয়ের কর্তাই তিনি (কালী)। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনী-কাঞ্চনে বদ্ধ আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত। তিনি ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী। এক ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন,—মহাশয়! সব ত্যাগ না করলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?

রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, না গো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বশে বেশ আছো! সারে-মাতে। তোমরা সংসার করছো—এতে দোষ নেই, তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখবে তা নাহলে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো, কর্ম শেষ হলে দুহাতে ঈশ্বরকে ধরবে। মন নিয়ে কথা। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত, মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। দেখনা, যদি একটু ইংরাজী পড় তো ইংরাজী কথা এসে পড়ে ফুট্‌ফাট্, ইট্‌মিট্। আবার যে পণ্ডিত সংস্কৃত পড়ে

—সে শ্লোক ঝাড়বে। মনকে যদি কুসঙ্গে রাখো তো সেই রকম কথাবার্তা চিন্তা হয়ে যাবে। যদি ভক্তের সঙ্গে রাখো, চিন্তা হবে ঈশ্বর, হরিকথা। তাই বলছি মন নিয়েই সব। একপাশে পরিবার—একপাশে সন্তান, একজনকে একভাবে আর সন্তানকে আর একভাবে মানুষ আদর করে। মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্ত পুরুষ—আমি সংসারেই থাকি আর অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? ঈশ্বরের নামে তখন বিশ্বাস হওয়া চাই "কি"? আমি তাঁর নাম করেছি—আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?

কৃষ্ণকিশোর নামক এক পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কিভাবে বৃন্দাবনে গিয়ে অত্যন্ত তৃষ্ণার সময় মুচির হাতের জল পান করেছিল, সেই কথা ঠাকুর বললেন—কৃষ্ণকিশোর অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে একটা কুয়োর কাছে এসে দেখলেন একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। —একঘটি জল দিতে পারিস্? দে না, তেষ্টা পেয়েছে?

সে বললে, ঠাকুরমশায়, আমি হীন জাত মুচি।

কৃষ্ণকিশোর বললে, তুই বল 'শিব'—নে এখন জল দে। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন শুদ্ধ হয়ে যায়। কেবল 'পাপ' আর 'নরক'—এই সব কথা কেন? একবার বল, অন্যায় কাজ যা করেছি আর করবো না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। এরপর রামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে নামমাহাত্ম্য গাইলেন।

গান শেষে আলোচনান্তে খাবারের ব্যবস্থা হ'ল, যেন আনন্দের হাট বসেছে। ঠাকুর দেখলেন, কেশব ও বিজয় দুইজনে সঙ্কুচিত ভাবে বসে আছেন। 'সর্বভূতহিতেরত' বলে যেন দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ বিজয়কে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সত্যসত্যই ভালবাসতেন। ব্রাহ্ম আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ যখন তখন দক্ষিণেশ্বরে

রামকৃষ্ণের কথামৃত শুনতে আসতেন, এমন কি হিন্দুসন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করেও তিনি দক্ষিণেশ্বর এসেছেন বহুবার। তাই ঠাকুর বলতেন—বিজয়ের উচ্চ আধ্যাত্ম অবস্থা। দুর্লভ সত্যলাভে তার জীবন ধন্য হয়েছে।

ভাবোন্মাদে নৃত্য এবং সংকীর্তনকালে ঘন ঘন সমাধিলাভই হল ভগবৎলাভের স্তর—যার জন্য পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ বিখ্যাত হিন্দু মহামানব বলে পরিচিত ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে কেশব, শিবনাথ প্রভৃতি 'ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দ' আসতেন বটে, কিন্তু কেশব প্রভৃতি বিজয়ের ন্যায় ধর্মজগতে উচ্চস্থান অধিকার করতে পারেন নাই। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্যই শিবনাথ প্রভৃতি প্রায় পূর্ববৎই ছিলেন। তবে একথা অতি সত্য—ব্রাহ্ম কেশব সেন রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় রীতিমত প্রচার না করলে এবং ব্রাহ্মসমাজ ঠাকুরের অধ্যাত্ম আদর্শ কিছু কিছু গ্রহণ না করলে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ও স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হতেন কিনা সন্দেহ। নরেন, রাখাল তো ব্রাহ্ম হয়েইছিলেন, শরৎ, শশী, তারক, কালী, হরিপ্রসন্ন প্রভৃতি ত্যাগী শিষ্যবৃন্দ শ্রীম প্রভৃতি গৃহী ভক্তবৃন্দ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়েই ঠাকুরের সাথে মিলিত হন। এক কথায় বলা চলে—ব্রাহ্মসমাজই ছিল ঠাকুরের সাথে তরুণ ভক্তদের মিলন-মন্দির।

তিনি কেশব-বিজয়কে বলছেন, তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ—যেন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো। দুজনে ভাবও হলো কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বাঁদর-গুলোর ঝগড়া কিচ্‌মিচ্‌ আর মেটে না। আপনার লোক এরূপ হয়ে থাকে। লবকুশ যে রামের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো, মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, মায়ের মঙ্গল মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা! তেমনি তোমাদের। এর একটি

সমাজ আছে আবার ওর একটি দরকার। তবে এসব চাই। তবে যদি বলো ভগবান নিজে লীলা করবেন—সেখানে জটিলে কুটিলের কি দরকার? জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না এবং জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড়ও হয় না—বলে ঠাকুর উচ্চহাস্য করলেন।

ঠাকুর কেশবকে বলছেন—তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এরূপ ভেঙ্গে যায়। মানুষগুলি দেখতে একরকম কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি। কারো ভেতর সত্ত্বগুণ বেশী, কারোর রজোগুণ বেশী, কারোর তমোগুণ। আমার কি ভাব জান? খাই দাই থার্কি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—'গুরু-কর্তা-বাবা'। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দেবেন। আমার সন্তান ভাব; মানুষ-গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়? গুরু তো সকলেই হতে চায় কিন্তু চাপরাস কই? লোক-শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্য লোক। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হিতে বিপরীত! ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়, কার কি রোগ বোঝা যায়, উপদেশ দেওয়া যায়। চাপরাস পেলে পর সে-কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। কেবল লেকচারে কি হবে? দিনকতক লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। সে কথা অনুসারে কাজ করে না।—আদেশ না থাকলে আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি এ অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। বোধ হয় আমি কর্তা। ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হলে তো সে জীবন্মুক্ত। আমি কর্তা, আমি কর্তা এই বোধ থেকেই যত দুঃখ অশান্তি।

এর পরই তিনি বলছেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম। ব্রহ্মভক্তদের বলছেন, তোমাদের ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর। মায়ের

নাম গুণগান কর—তোমরা ধন্য।—এরপর আরো বহু আলোচনার পর জাহাজ থেকে সকলে নেমে এলেন।

ঠাকুর সুরেন্দ্রের বাড়ী এসে নরেনকে ডাকিয়ে আনিয়ে জাহাজ ভ্রমণের কথা বলে দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন।

একদিন কেশব রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্র পাঠ করেন কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন?

ঠাকুর বললেন, যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে ওড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে, তাদের মন সর্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাকার দরুণ জ্ঞানলাভ করতে পারে না। গ্রন্থ নয়! গ্রন্থি—গাঁট। বিবেক বৈরাগ্যের সাথে বই না পড়লে পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র। যেমন খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলে ভক্‌ভক্‌ শব্দ করে কিন্তু ভরে গেলে শব্দ হয় না, তেমনি যার ভগবান লাভ হয়নি সেই ভগবান সম্বন্ধে গোল করে আর যে তাঁর দর্শন লাভ করেছে সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে। বিবেক বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া মিছে—বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভও হয় না।

আর একদিন কেশব পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান এক, তবে ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত বাদ-বিসংবাদ দেখা যায় কেন?

ঠাকুর বললেন—যেমন পৃথিবীতে এটা আমার জমি, এটা আমার বাড়ী, বলে ঘিরে বসে থাকে কিন্তু ওপরে এক অনন্ত আকাশ, সেখানে যেমন কেউ ঘিরতে পারে না, তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে বৃথা গোল করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান হয় তখন আর পরস্পরের বিবাদ থাকে না। যাদের সংকীর্ণ ভাব তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে

ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়। আর যারা ঈশ্বরানুরাগী, কেবল সাধন ভজন করতে থাকে, তাদের ভেতর কোন দলাদলি থাকে না। যেমন, পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল (কলমি) জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না। ভগবানের নাম ও চিন্তা যেরকম করেই করনা কেন তাতেই কল্যাণ হবে। যেমন মিছরীর রুটি সিধে করে খাও আর আড় করেই খাও—খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।

এরপর বললেন, ভগবান এক, সাধকভক্তেরা ভিন্নভাবে ও রুচি অনুসারে উপাসনা করেন—বলে তিনি গৃহস্থ বাড়ীর মাছের উপমা দিয়ে বললেন—বাড়ীতে বড় মাছ এলে কেউ ঝাল করে, কেউ ভাজে, কেউ তেল হলুদ চচ্চড়ি করে, কেউ ভাতে দিয়ে, কেউ বা অম্বল করে খেয়ে থাকে, সেইরূপ যাদের যেমন রুচি তারা সেইরূপ ভাবে ভগবানের সাধন ভজন উপাসনা করে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা, শিক্ষা ও উপদেশ ছিল অপূর্ব, তা না হলে যে কেশব সেন তখনকার দিনে জ্ঞানে, গরিমায়, শিক্ষায়, বক্তৃতায় ও সংগঠন শক্তিতে এবং ভগবৎ সাধনায় ছিলেন শ্রেষ্ঠব্যক্তি—সেই কেশব যখন তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপদেশ গ্রহণ করতে আসতেন না। কেশব ঠাকুরকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন—যার জন্য তিনি একদিন বলরামকে বলেছিলেন, তোমরা বুঝতে পারছ না—উনি কে? তাই অত ঘাঁটা-ঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভাল একটি গ্লাস-কেসের মধ্যে রাখবে, দু-চারটি ফুল দিবে, আর দূর হতে প্রণাম করবে! কেশবের এরূপ বলার উদ্দেশ্য 'দেবমানব' যুগে যুগে আগমন করেন না, কদাচিৎ কখনও জগতের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন। ঠাকুরও কেশবকে ভালবাসতেন এবং রীতিমত শ্রদ্ধাও করতেন। কেশবকে ঠাকুর প্রণাম পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়েছিলেন যার জন্য পরবর্তীকালে কেশব অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করত।

কেশবের প্রথম যখন খুব কঠিন পীড়া হয় তখন ঠাকুর ব্যাকুল-ভাবে মা সিদ্ধেশ্বরীকে ডাব, চিনি মানত করেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, আগেকার অসুখের সময় রাত্রির শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম আর বলতুম, কেশবের যদি কিছু হয় তবে কার সঙ্গে কথা কইব। দ্বিতীয়বার অসুখের সময় ঠাকুর কেশবকে বসরাই গোলাপ বলেই বললেন—আরো বড় গোলাপ ফুটবে বলে বাগানের মালী ফুল গাছের গোড়া খুঁড়ে রৌদ্রালোকে ও শিশিরে শিকড়গুলি উন্মুক্ত করে রাখে অর্থাৎ শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে বলে শেকড়শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। কেশবজননী কেশবকে আশীর্বাদ করতে বলায় ঠাকুর বলছেন—আমার সাধ্য কি? তিনিই আশীর্বাদ করেন। এর পরই তিনি বললেন, ঈশ্বর দুইবার হাসেন—যখন দুভাই জমির বখরা করে তখন, আর যখন ছেলের সঙ্কটাপন্ন অসুখের সময় বৈদ্য মাকে বলেন, ভয় কি মা, আমি ভাল করব। বৈদ্য জানেন—ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষা করেন।—এর বেশী তিনি আর বলতে পারেন নাই, অবশ্য কেশবের দেহরক্ষার পর তিনি আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন।

সকলেই জানেন, হৃদয় মুখুয্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাগ্নে। দীর্ঘদিন সে পরমহংসদেবের বিস্তর সেবাযত্ন করেছে।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি ছেড়ে হৃদয় মুখুয্যে কিছুকাল অন্যত্র কাজ করেছে। তারপর সে পূজারীর কাজ পেল কাঁকুড়গাছি রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে, নানা কারণে সেখান থেকেও সে বিতাড়িত হল। অতঃপর হৃদয় মুখুয্যে পথে-পথে তসরের কাপড় ফেরি করে বেড়াত। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো!

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহরক্ষা করার কিছুকাল পরের কথা। তাঁর কয়েকজন শিষ্য আলমবাজারের মঠে থাকেন। সেই মঠের সামনে দিয়ে তসরের কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে হৃদয় মুখুয্যে যাচ্ছে একদিন। বেলা তখন দশটা হবে। হৃদয়ের ইচ্ছা হল, মঠে একবার তামাক খেয়ে যাই।

ঢুকে পড়ল মঠে। বড় ঘরটিতে কাপড়ের পুঁটলি রেখে ভিতরে এসে ঠাকুর প্রণাম সেরে হৃদয় এল শিবানন্দ স্বামীর কাছে। শিবানন্দ স্বামী তখন একটি ছোটো হুকোয় তামাক খাচ্ছিলেন।

নিরঞ্জন মহারাজ হৃদয়কে দেখতে পেলেন। বললেন—কি মুখুয্যে, কেমন আছ?

হৃদয় বলল—আর দাদা, মরে আছি, আর কি সেদিন আছে? মামা গেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে। খালি দেহটা ঘুরে বেড়াচ্ছে—তবে পেটটা তো আছে, তাই কিছু চেষ্টা করতে হয়।

শিবানন্দ স্বামীর হাত থেকে হুকোটি নিয়ে খানিক তামাক খেল হৃদয় মুখুয্যে।

শিবানন্দ স্বামী বললেন—হ্যাঁ হে মুখুয্যে, তিনি যখন কেশব-বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন তুমি তো সঙ্গে ছিলে—কি সব হয়েছিল একবার বলো তো?

হৃদয় মুখুয্যে বলতে সুরু করলো—একটা গাড়ি করে মামা আর আমি ক্যাশববাবুর বাড়ি চললাম। গাড়িতে আমি মামাকে বলতে লাগলাম, ক্যাশববাবু বড়মানুষ, বড়লোক, তার বাড়িতে গিয়ে তুমি এমন বেফাঁশ এলোমেলো কথা বলো কেন? তুমি বড় ...'

গাড়ি চলছে—হৃদয় মুখুয্যে বলছে। পুরনো দিনের কথা।

গাড়ি পৌঁছলো যথাস্থানে। কেশবচন্দ্র এগিয়ে এসে পরমহংস-দেবকে সযত্নে বসাতে গেলেন। পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রকে বললেন—ও ক্যাশব, আমি তোমায় কি বলেছি? হৃদু তাই পথে আমায় বকছিল আর '...' বলে গাল দিচ্ছিল।

'....' মানে একটি গ্রাম্য গালাগাল। পরমহংসদেবের মুখে তার উচ্চারণ কেশবচন্দ্রের কানে মধুবর্ষণ করল। কেশবচন্দ্র হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন—হৃদু আপনাকে রাস্তায় কী বলে গাল দিয়েছে?

পরমহংসদেবের মুখে আবার উচ্চারিত হল শব্দটি। কেশবচন্দ্র উঁচু-গলায় হাসতে লাগলেন। একটু পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন —হৃদু আপনাকে কি বলে গাল দিয়েছে ?

আবার। আবার কেশবচন্দ্রের উচ্চকণ্ঠ হাসি।

তারপর কেশবচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—আজকে কি মনে করে এসেছেন ?

পরমহংসদেব বললেন—ক্যাশবের মন ভোলাতে দূতীগিরি করব বলে এসেছি।

বলে পরমহংসদেব পরনের লালপেড়ে কাপড়খানি মাথায় ঘোমটার মতো দিয়ে দূতী সাজলেন, কেশবচন্দ্রের মুখের কাছে হাত নেড়ে দূতী-সংবাদ গাইতে লাগলেন। কেশবচন্দ্র মহানন্দে তাড়াতাড়ি খোল নিয়ে নিজেই বাজাতে আরম্ভ করলেন আর পরমহংসদেব নেচে-নেচে দূতী-সংবাদ গাইতে লাগলেন।

কতদিন আগের কথা। আলমবাজারের মঠে সে সব কথা বলতে-বলতে হৃদয় মুখুয্যের চোখের সামনে সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। পরনের কোঁচাটি মাথায় দিয়ে স্বয়ং দূতী সেজে হৃদয় মুখুয্যেও সেই দূতী-সংবাদ অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন।

ওদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সকলের সঙ্গে মঠে স্নানাহার সেরে হৃদয় মুখুয্যে আবার তসরের কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে পথে-পথে ফেরি করতে বেরিয়ে পড়ল।

মাঝে-মাঝে আলমবাজারের মঠে আসত হৃদয় মুখুজ্যে। মাঝে-মাঝে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তো। ১৮৯৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে উৎসব দেখতে এসে হৃদয় মুখুয্যে দুঃখ করে বলেছিল—যখন কেউ আসেনি তখন আমি মামার এত করে সেবা করেছিলুম কিন্তু এখন আমায় কেউ পোঁছে না। বেড়ালটা একবার দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাকে কি কেউ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় ?

প্রণামতত্ত্ব ও জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে ঈশ্বরের সার-রহস্য

(মহাকবি গিরিশ ঘোষের সঙ্গে)

বাগবাজারের গিরিশ ঘোষ, যে অত্যন্ত দম্ভী, তর্কপ্রিয়, ভগবানে অবিশ্বাসী, যে দিনরাত মদে ও নানাবিধ নেশায় চূর হয়ে থাকে, যে অবিদ্যা মায়েদের নিয়ে থিয়েটার করে ও থিয়েটারের বই লেখে, অকাজ কুকাজের রাজা, যাকে দেখলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনবরত নমস্কার করতেন, সেই গিরিশ ঘোষ ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করে জানতে পেরেছেন রামকৃষ্ণের কথা।

গিরিশ লোকমুখে শুনতে পেলেন, দীননাথ এটর্নীর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ এসেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে সাক্ষাৎ দর্শন-মানসে গিরিশ দীননাথের বাড়ী ছুটে এলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্মুখে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনকে দেখেই গিরিশের মনে এই ধারণা হল— আজকাল ব্রাহ্মগণ আবার তাদের ভোল বদলাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। তারা এখন হরি ধরেছে, মা ধরেছে ও মায়ের নাম করছে, লোক বাগাবার জন্য আবার একজন পরমহংসও খাড়া করেছে দেখা যাচ্ছে।

দীননাথের বাড়ী লোকে লোকারণ্য, অত্যন্ত ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যে ঢুকে গিরিশ দেখতে পেলেন—ঠাকুর মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হচ্ছেন ও সমাধি ভঙ্গ হলে সম্মুস্থ কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ ও সমবেত জনমণ্ডলী ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী তন্ময় হয়ে শুনছেন। এরই মধ্যে সন্ধ্যে হয়েছে, কেউ সেজ জ্বেলে রেখে গেল ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখনও অর্ধবাহ্য অবস্থায়

আছেন। এই অবস্থায়ই তিনি বললেন, সন্ধ্যে হয়েছে? ঠাকুরের কথা শুনে গিরিশ তেতে উঠলেন। ঢং, দিব্যি সেজ জ্বলছে সামনে, আর বলছেন কিনা সন্ধ্যে হয়েছে? সন্ধ্যে না হলে আলো কেন? পুনঃ ঠাকুর বলে উঠলেন, সন্ধ্যে হয়েছে? কে একজন উত্তর দিল—হাঁ।

গিরিশ আগে থেকেই তেতেছিলেন। গিরিশ ভাবতে লাগলেন—কেউ একজন বলে না দিলে সন্ধ্যে হয়েছে কিনা যেন বোঝা যাবে না? চোখের সম্মুখে আলো জ্বেলে দিলেও না? বুজরুকি আর কাকে বলে? বিরক্তিতে গিরিশের সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো।

গিরিশ বাড়ী ফিরে যাবার পর সদরালা গিরিশের পিশে-মশাই গোপীনাথ বোস জিজ্ঞেস করলেন, কেমন দেখলে হে? গিরিশ একেবারে নস্যাৎ করে বলল, 'বুজরুকি।'

এর পর ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গিরিশ পুনঃ দেখতে এসেছেন বাগবাজারের বলরাম মন্দিরে। বলরাম মন্দিরে অনেকেই এসেছেন। বিধুকীর্তনওয়ালীও সেখানে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করছে, ঠাকুর তাকে প্রতিনমস্কার করে তার সাথে পরিহাস ও মধুর আলাপ করছেন। শিশির অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী শিশির ঘোষের ভাল লাগলো না এই আলাপ ও প্রতিনমস্কার। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র গিরিশকেই দেখতে পেলেন। গিরিশকে তাঁর বিরক্তির কারণ ব্যক্ত করে বললেন,—চল হে গিরিশ, আর কি দেখবে?

গিরিশের আর একটুকাল অপেক্ষা করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শিশির তাঁর হাত ধরে একপ্রকার জোর করেই টেনে নিয়ে গেলেন। গিরিশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে এলেন শিশিরের সাথে। বৈষ্ণবচূড়ামণি শিশির তো আর জানেন না বা চিন্তাও করলেন না—ঠাকুরের আবির্ভাব কেন? তখন শিশির ঘোষ জানতেন না—ঠাকুরের কাছে পাপী নেই, তাপী নেই, নাচওয়ালী, কীর্তনওয়ালী ও

উচ্চ-নীচের নেই কোন ব্যবধান। তাঁর কাছে বিষ্ণুময় জীব, তাঁর আবির্ভাব দয়ার জন্য নয়—শিবজ্ঞানে জীবের পূজার জন্য। তাই বিধুকীর্তনওয়ালীর সাথে সর্বজনসমক্ষে সরলভাবে আলাপ করতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (তখনকার দিনে এটা অত্যন্ত অন্যায় কার্য ছিল), এমন কি কীর্তনওয়ালীর প্রণামের প্রতিনমস্কারও ঠাকুর করেছিলেন। গিরিশ অবশ্য প্রতিনমস্কার করতেন কিন্তু নমস্কারের প্রতিযোগিতায় গিরিশ হেরে যেতেন যার জন্য শেষ প্রণামটি ঠাকুরের জন্য তোলা থাকত। কেশবের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য ছিল, ঠাকুর কেশবকে নমস্কার করতেন আর তার প্রতি দানে কেশব ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিত, অবশ্য এই কেশবও একদা গিরিশের ন্যায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে দ্বিধা করেন নাই। কিংবদন্তী—তিনি নাকি শেষকালে পুষ্পস্তবকে ঠাকুরের পদদ্বয় পূজাও করেছেন।

ঠাকুরের প্রণাম পদ্ধতি দেখলে মনের ভিতর এই ধারণা জন্মে—দেবতারা দেবী দুর্গাকে কিভাবে প্রণাম করেছিলেন। দেবতারা যখন দেবী দুর্গাকে মহা-সরস্বতীরূপে প্রণাম করেছিলেন তখন সেই প্রণামের মধ্যে তাঁদের আমিত্ব, মমত্ব, দর্প, অহংকার বর্জন করে তনুমনপ্রাণ নিবেদন করেছিলেন প্রণামের মধ্যে, তাই মন্ত্রে আছে—

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্মতাম্।

শুম্ভ নিশুম্ভ দ্বারা পরাজিত লাঞ্ছিত দেবতারা দেবী দুর্গাকে নানাভাবে স্তবস্তুতি করে শেষে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা—
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

প্রভৃতি মন্ত্রদ্বারা বহুভাবে প্রণাম করেছেন। দেবতারা স্তব করতে আরম্ভ করেই সর্বপ্রথম উচ্চারণ করলেন "নমঃ" মন্ত্র বলে।

তাঁরা তাঁদের আমিত্ব-বোধকে সর্বতোভাবে বিনষ্ট করে ফেললেন। প্রণামের মধ্যে তাঁদের দম্ভ, পৌরুষ, অহমিকা সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়ে গেল। দেবী দুর্গা দেবতাদের উপর প্রীত হলেন এবং ঘোর অন্ধকার অবস্থা থেকে তাঁদের জ্যোতির্ময়লোকে নিয়ে এলেন। দেবতাদের প্রণাম দেখে এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রণাম রহস্যের বিষয় অবগত হয়ে মনে হচ্ছে এই প্রণামের মধ্যে কত রহস্য বা তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। ঠাকুর কেশবের মধ্যে শক্তির বিকাশ দেখে তাঁকে প্রণাম করে অহমিকার বেড়া ভেঙ্গে ফেললেন। গিরিশকে ভৈরবজ্ঞানে (যদিও সাংসারিক ভাব ধারায় তিনি একজন মদ্যপ চরিত্রহীন ছিলেন) ঠাকুর তাঁর দেখা পেলেই অনবরত নমস্কার (ভূঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম) করে যাচ্ছেন, গিরিশও প্রতিনমস্কার করে যাচ্ছেন তবে শেষ প্রণামটি রইল ঠাকুরের জন্য। গিরিশ প্রণামের পাল্লায় হেরে যেতেন। ঠাকুর জানতেন আমিত্বের উন্নত শির অবনত করবার পক্ষে প্রণামের মত সহজ উপায় আর কিছু নেই, তাই নিজে ভক্তি নম্র হয়ে মানী অমানী, গুণী জ্ঞানীকে প্রণাম করে ঊনবিংশ শতকের দেশকে শিখিয়ে গেলেন প্রণাম পদ্ধতি।

তখনকার ইয়ং বেঙ্গলদের প্রণাম সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেন, এই যে দেখছ সব ইয়াং বেঙ্গল (young Bengal), এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারত? মাথা নুইয়ে পেরনামটা করতেও জানতো না। মাথা নুইয়ে আগে পেরনাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের বাড়ীতে দেখা করতে গেলাম, দেখি, চেয়ারে বসে লিখছে মাথা নুইয়ে—পেরনাম করলাম তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে। তারপর আসবার সময় একে-বারে ভূঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেরনাম করলুম, তাতে হাত জোড় করে একবার মাথায় ঠেকাল। তারপর যত যাওয়া আসা হতে লাগল ও কথাবার্তা শুনতে লাগলো আর মাথা হেঁট করে পেরনাম করতে

লাগলাম তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হয়ে আসতে লাগলো, নইলে আগে ওরা কি ভক্তি-টক্তি করা জানতো, না মানতো?

সর্ব দম্ভ ও অহঙ্কার এবং মানের বোঝাকে লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃষ্টরূপে অবনত হবার নাম 'প্রণাম'। আমি বলে যে, অজ্ঞানের বোঝা লয়ে জ্ঞানের গর্বে আমরা মাথা উন্নত করি, ঐ আমিত্ব-বোধকে ঐ অজ্ঞানের ভাবটাকে জ্ঞানের সমীপে সম্যক অবনত করার নামই হল প্রণাম। যে ব্যক্তি তার জ্ঞান, বুদ্ধি, অজ্ঞানতা, অক্ষমতা, দীনতা, দুর্বলতা প্রভৃতিকে জ্ঞানময়ী মায়ের পদতলে অর্পণ করতে পারেন তাঁর প্রণামই হয়ে দাঁড়ায় 'সার্থক প্রণাম'। নিরক্ষর দীন দরিদ্র রামকৃষ্ণও মা ব্রহ্মময়ীর পদতলে তাঁর আমিত্ব, অজ্ঞানতা, ক্ষমতা প্রভৃতি অর্পণ করতে পেরেছিলেন বলেই আজ জগতের মাঝে তিনি পূজিত হচ্ছেন "দেবমানব" রূপে। তজ্জন্যই ঠাকুর মানী, অমানী ও যে-কোন বিষয়ের গুণী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁদের সাথে দেখা করতে যেতেন এবং সাক্ষাৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানাতেন। তিনি বলতেন, যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি, এমন কি যে খুব সুন্দর তার মধ্যেও ঈশ্বরের সার বিদ্যমান।

গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের কাছ থেকে তত্ত্বকথা লাভ করা সহজ হবে। এই মন্ত্রের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বয়ং। তিনি যে প্রণাম করতেন, সে প্রণামের মধ্যে অহং কর্তৃত্ব জ্ঞান থাকতো না। তিনি তাঁর জীবনবেদের মাধ্যমে প্রণাম করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন ব্রহ্মবিদ্যার কথা, জগৎ-তত্ত্বের বিশ্লেষণ, আরও তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন আত্মসাক্ষাৎকার প্রভৃতি অতি সহজেই সম্ভব হয়, যদি নিজের অহংকার বিসর্জন দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও মা! মা! বলে ডেকে তদ্‌গত হয়ে প্রণাম করা যায় বা কোন ভক্ত প্রণাম করতে পারেন, তবে তাঁর মনুষ্য-জন্মের

উদ্দেশ্য হবে সিদ্ধ। পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁর আমিত্বের উচ্চশির অবনত করেছিলেন বলেই কেশবের জীবনে তিনি অপূর্ব পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। দাম্ভিক, অহংকারী অকাজ-কুকাজের রাজা গিরিশকে প্রকৃত মানুষ করতে পেরেছিলেন। আর দর্পী, তার্কিক, বিদ্যা ও বংশগর্বে গর্বিত নরেনের সম্মুখে হাত জোড় ক'রে দেবতাকে যেরূপভাবে স্তবস্তুতি করে, তদ্রূপ স্তব করে, জগৎজয়ী বিবেকানন্দ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভগবান দাস বাবাজী, শশধর পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, প্রতাপ মজুমদার, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি দর্পী পণ্ডিতমণ্ডলীকেও স্বমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন সার্থক প্রণামের দ্বারা।

রামকৃষ্ণের কাছে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণু থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বর পর্যন্ত সকলেই গুরু বা শিব অথবা সচ্চিদানন্দরূপ ছিল বলেই তিনি বিধু কীর্তনওয়ালীকে প্রতিনমস্কার করতে বা তার সাথে আলাপ আলোচনা করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি। অহংকারশূন্য প্রণাম যখনই আয়ত্ত করা যাবে তখনই জীবন হবে ধন্য, জগৎপিতার অনুগ্রহ লাভ হবে সহজ। আমিত্ববোধ বিসর্জন দিয়ে প্রণাম করলে পর দীনহীন কাঙ্গাল হতে হয় না—বরং প্রণম্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়ে প্রণাম করলে অহমিকা লুপ্ত হয়ে সেখানে ফুটে উঠবে আধ্যাত্মিক শক্তি, সেখানে প্রকাশিত হবে প্রণম্য ব্যক্তি অপেক্ষা আমি 'দীন' এই ভাব। তাই ঠাকুর মানী অমানী সকলকে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রণাম জানাতেন। যার প্রণাম যত সরল, কৃত্রিমতাহীন, অহংকারবর্জিত হবে তিনি ততই সহজে অভীষ্ট লাভ করবেন। দেবতারাও এইরূপ কৃত্রিমতাশূন্য অহংকারবর্জিত প্রণাম করেছিলেন বলেই অতি সহজে দেবী দুর্গার কৃপালাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই দেবীই দ্যোতনশীলা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, জীব-জগতাকারে বিশ্বমূর্তিতে সতত প্রকাশিত মায়ের

স্থূল মূর্তি। মায়ের স্থূল মূর্তিকে প্রণাম করেই দেবতারা মায়ের সূক্ষ্ম মূর্তি শিবা মূর্তিকে প্রণাম করলেন 'শিবায়ৈ সততং নমঃ' বলে। এরপরই দেবতারা মাকে প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ বলে নমস্কার করলেন, ভদ্রা মঙ্গলময়ী প্রকৃতি। স্থূল ও সূক্ষ্মের যিনি কারণ সেই 'ভদ্রা' সন্তানের মঙ্গলদায়িনী। জীব তাঁরই কৃপায় স্থূল-সূক্ষ্ম-অতীত ক্ষেত্রে উপনীত হয় তাই মা মঙ্গলদায়িনী অব্যক্তা। তাঁর সন্ধান দেবমানব ব্যতিরেকে সাধারণ সাধক পায় না। সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণের অতীত মা—যিনি বাক্য মনের অগোচর সেই অজ্ঞেয়া "জ্ঞ"-স্বরূপা, নিত্যসত্যস্বরূপা জননীকে দেবতারা ভক্তিনত হয়ে প্রণাম করে যাচ্ছেন। দেবতারা আজ দেবত্বের অহমিকা, পদ-গৌরব, দর্প-অহংকার প্রভৃতি বিসর্জন দিয়ে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে রোধ করে তদ্‌গত হয়ে মাকে প্রণাম করে যাচ্ছেন। এরূপভাবে যাঁরা মাতৃ-শক্তিকে বা আত্মাকে প্রণাম করতে পারেন বা দর্শন করতে পারেন, তাঁদের নিকটই মায়ের সুখময়ী মূর্তির বিকাশ ও প্রকাশ হয়ে থাকে। তাই দেবতারা সুখায়ৈ সততং নমঃ বলে প্রণাম কচ্ছেন। সাধকের নিকট মায়ের সর্বমঙ্গলময়ী কল্যাণী মূতি যখনই প্রকাশিত হবে তখনই সেই সাধকের নিকট অকল্যাণ বলে কিছু থাকবে না। তিনি তখন তাঁর চোখের সম্মুখে দেখতে পাবেন সর্বব্যাপী কল্যাণ, তাঁর কাছে জীব, জগৎ, ও কীট-পতঙ্গাদি হবে শিবময়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে মা ভবতারিণী কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হতেন বলেই তিনি শিবরূপী জীবের সেবারূপ পূজার কথা বলে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। ঠাকুর নিজের সত্তা, নিজের আমিত্ব, নিজের কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে মায়ের পদতলে আত্মসমর্পণ করে দেবতাদের ন্যায় বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বেদে এই আনন্দকে 'রসো বৈ সঃ' বলেছেন অর্থাৎ এখানে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমের আধার বলে কোন ভেদ নাই।

কেবল প্রেম ও কেবল রস অর্থাৎ আনন্দ। আনন্দ ব্যতীত আর কিছু নেই। নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জনা আনন্দময়ী মাকে ভক্তিনম্রশিরে দেবতাদের ন্যায় প্রণাম করতে পেরেছিলেন বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সদা আনন্দ-রসে ডুবে থাকতেন।

মা-ব্রহ্মময়ী যেমন আনন্দময়ী, স্নেহময়ী, দয়াময়ী অতি সৌম্যা অপর দিকে তিনি আবার অতি রুদ্রা, ভয়ঙ্করী, ভীষণা কৃষ্ণমূর্তি করালবদনা। আমরা দেখতে পাই মা সৃষ্টি স্থিতি যেমন করেছেন তদ্রূপ তিনি মহাপ্রলয়েরও অধিকারিণী। মা রুদ্রারূপে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প প্রভৃতি দিয়ে সন্তানদের ক্লেশ প্রদান করেন কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি সৌম্যা, স্নেহময়ী ও কল্যাণময়ী মূর্তিতে জীবজগতের মঙ্গল বিধান করে থাকেন। মা যেমন সৃষ্টিরূপিণী জননী, তেমনি তিনি মহাপ্রলয়রূপিণী রৌদ্রাও বটেন। আমরা যখন ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কৃতঘ্নতা, ভ্রূণহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হোয়ে মায়ের কথা ভুলে যাই তখন মা রৌদ্রারূপে শাস্তি প্রদান করেই পুনঃ তিনি তাঁর অভয় কোলে টেনে নেন। দুরন্ত সন্তান কোন অন্যায় কার্য সমাধা করবার অপরাধে তার জননী দ্বারা প্রহৃত হবার পরই জননী সৌম্যা মূর্তিতে সন্তানকে কোলে নিয়ে স্তন্য বা পানাহার প্রদান করেন, ব্রহ্মময়ী মাও অনুরূপভাবে জীবকে শাস্তি প্রদান করেই শান্তির ধারা ছুটিয়ে দেন। তাই ঠাকুর বলেন —দর্প, অহংকার, পাটোয়ারী বুদ্ধি ও আমিত্ব জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে সরল শিশুর ন্যায় কাতরকণ্ঠে মা! মা! বলে ডাকলে পর তুমি আনন্দে রসে ডুবে থাকবেই।

গিরিশ দক্ষিণেশ্বর এসে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, এ প্রণাম আর কিছুই নয়—'একেবারে আত্মসমর্পণ'—নেই সেখানে কূটবুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, দর্প, অহংকার প্রভৃতি। ঠাকুর গিরিশকে গ্রহণ করে বললেন, জানি, তুই আসবি!

ঠাকুর তাকে পাশে বসতে ইশারা করলেন। মুক্তিদাতা ঠাকুর

স্মিতহাস্যে বললেন গিরিশকে, এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল!

গিরিশ ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বিনীত ভাবে বললেন, আপনি জানেন না আমি কত বড় পাপী, আমি যেখানে বসি, সাত হাত মাটি পর্যন্ত তলিয়ে যায় পাপের ভারে।

অভয়মাখা হাসি হেসে বললেন ত্রাতা রামকৃষ্ণ, তাই নাকি? তুমি এত পাপী যে, পতিতপাবনও সে পাপ হরণ করতে অক্ষম। তাই না?

যে একদিন ঠাকুরের সমাধিকে 'ঢং' বলেছিল এবং ভাবমুখের কথাকে বলেছিল বুজরুকি, সেই গিরিশ আজ মর্মপীড়িত হয়ে বলে ফেললে, 'কিন্তু আমি যে পাপের পাহাড় করে ফেলেছি'।

স্মিতহাস্যে জগতের ক্লান্তিহরণ ঠাকুর রামকৃষ্ণ (গৌতম ঋষি যেমন সত্যকামকে বলেছিলেন, অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত, তুমি দ্বিজোত্তম) বললেন গিরিশকে, ওতো তুলোর পাহাড়, একবার মা বলে ফুঁ দে, উড়ে যাবে।

অভয়বাণী পেলেন গিরিশ, পেলেন অকূলে কূল, যেরূপ সোনার কাঠির পরশে নরঘাতক দস্যু রত্নাকর পরিণত হলেন ঋষি বাল্মিকীতে এবং জগতের মধ্যে মহাকবি হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনও লাভ করেছিলেন—আজ গিরিশও তাঁর সর্ব অহংকার, দর্প, প্রভৃতি ঠাকুরের পাদপদ্মে বিসর্জন দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরণে। এখন আর তাঁর নিজের সত্তা কিছু রইল না সেখানে। বিশ্বরূপ দর্শন করে ভীত ত্রস্ত অর্জুন বলেছিলেন—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিত বিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥

হে সর্বোত্তম, অনন্ত বিক্রম বীর্য, সর্বব্যাপ্ত, প্রভু, গুরু, আমি তোমার অগ্রে প্রণাম করছি, পৃষ্ঠদেশে এবং তোমার সর্ব দিকে প্রণাম করছি। তোমার মহিমা না জেনে আমি তোমায় কত কি বলে সম্বোধন করেছি, অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রভু।

মহাবীর অর্জুন তাঁর বীরত্বের গরিমা, তাঁর বংশমর্যাদা, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, সকলই নিবেদন করলেন ভগবানের চরণে প্রণামের মাধ্যমে। এক কথায় বলতে গেলে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আজ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করলেন পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে ; অর্জন করলেন পরম শান্তি ও পরম জ্ঞান। গিরিশও তদ্‌গত হয়ে অহমিকার গুরুভার বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন দেবমানব পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে, তাইনা ঠাকুর তাঁর বকল্‌মা গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ গিরিশকে কিছুই করতে হবে না, তাঁর সম্পূর্ণভার গ্রহণ করলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বয়ং। গিরিশ নেচে গেয়ে আনন্দ করে বেড়াক, পুঁথি লিখুক, সেই পুঁথি দিয়ে থিয়েটার করুক। তাঁর কিছুই করতে হবে না, যা করবার করবেন গিরিশের ইহকাল পরকালের ইষ্টগুরু প্রভু তিনি, যিনি গিরিশের মা, গিরিশের ভগবান—শ্রীরামকৃষ্ণ। আর গিরিশের কি চাই ? গিরিশ, তুমি নন্দের গোপাল হয়ে হামা দিয়ে বেড়াও, গায়ে ধূলো কাদা মাখ ; তোমার মা রামকৃষ্ণ ধূলোকাদা মুছে কোলে টেনে নেবেন। ধন্য গিরিশ, ধন্য তুমি ! সত্যিই তুমি গুরু রামকৃষ্ণের ন্যায় প্রকৃত প্রণামরহস্য বুঝেছিলে, তাইনা তোমার ভার বহন করিতে অগ্রসর হয়েছিলেন ভাবগ্রাহী জনার্দনরূপী রামকৃষ্ণ স্বয়ং।

রামকৃষ্ণের প্রণামতত্ত্ব সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আত্মচরিত পুস্তকে একটি অপূর্ব বর্ণনা দিয়ে বলেন, "রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া এই একটা ভাব আসিত যে, ধর্ম এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "একবার আমি দক্ষিণেশ্বর যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ বাড়ীর সন্নিকটস্থ ভবানীপুরের এক খ্রীষ্টীয় পাদরী আমার সাথে গেলেন। দক্ষিণেশ্বর পৌঁছিয়া যেই বলিলাম—মশায়, এই আমার একটি খ্রীষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন। এই

কথা শুনা মাত্র রামকৃষ্ণ অমনি প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা ছোঁয়াইয়া বলিলেন, 'যীশু খ্রীষ্টের চরণে শত শত প্রণাম।'

একেই বলে তদগত হয়ে প্রণাম। রামকৃষ্ণ যে-কোন অবতার, যে-কোন মহাপুরুষ, যে-কোন গুণী জ্ঞানী, যে-কোন বিখ্যাত গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়েকে প্রণাম করতেন অর্থাৎ যে-কোন বিদ্যায় পারদর্শী মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সার আছে মনে করে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রণাম করতেন—সে প্রণামের মধ্যে থাকতো অহংকারবর্জন নীতি।

তাই তিনি দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দিরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের বিদ্যার অভিনয়কারী ছোকরাকে উত্তম অভিনয় করবার জন্য প্রশংসা যেমন করেছেন, তদ্রূপ সাবলীলভাবে তার সাথে ঈশ্বরীয় আলোচনাও করেছেন। বিনোদিনীকে করেছেন দু'হাত তুলে আশীর্বাদ। দক্ষিণেশ্বর নাটমন্দিরে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা খুব ভাল হচ্ছে শুনে ঠাকুর মাকে দর্শন-কালে কান পেতে শুনছেন গান। যাত্রা শেষ হবার পর যাত্রাদলের অভিনেতারা এসেছে ঠাকুরের ঘরে, যে ছেলেটি বিদ্যা সেজেছিল তার অভিনয় দেখে ঠাকুর খুব আনন্দিত হয়েছেন। বললেন, বেশ করেছ তুমি!

অভিনেত্রী বিনোদিনীর চৈতন্য দেবের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বিনোদিনীর মাথার উপর দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, মা, তোমার চৈতন্য হোক! রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের ন্যায় দেবমানব—নামগোত্রহীন এক অভিনেত্রীকে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন কেন? এই প্রশ্ন অনেকের মনেই সতত জাগরিত হতে পারে? বিনোদিনী অভিনেত্রী হতে পারেন, গোত্রহীনা হতে পারেন কিন্তু বিনোদিনী ছিলেন ভক্তিমতী, বিনোদিনী ছিলেন প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পদরদী, তাই তিনি ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। কেবল তাই নয়—রামকৃষ্ণ যখন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তখন বিনোদিনী সাহেবী পোষাক পরিধান করে কর্তব্যনিষ্ঠ গুরু-অন্তপ্রাণ নিরঞ্জনের চোখে ধূলো দিয়ে দানাকালীর সাথে

রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে সাহসী হয়েছিলেন। ঠাকুর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করতে কার্পণ্য করেন নাই। ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন বলেই বিনোদিনী বাংলার সংস্কৃতি ও রঙ্গমঞ্চকে জীবন্ত করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। অভিনয় ও থিয়েটারকে বিনোদিনী অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাই তিনি ৫০,০০০ টাকার মায়া এককথায় ধূলোকণার ন্যায় ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। অবাঙ্গালী গুর্মুখ রায়—বিনোদিনীকে থিয়েটার ছেড়ে তার সঙ্গে বসবাস করতে অনুরোধ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ৫০ হাজার টাকার নোটের তোড়াগুলি বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে দিল। তখন কিন্তু বাংলার অন্যতম ভক্তিমতী খ্যাত মঞ্চশিল্পী সেই টাকার মোহ পরিত্যাগ করে ঐ টাকা রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পে ব্যয় করতে গুর্মুখ রায়কে অনুরোধ করলেন। একজন গোত্রহীনা অভিনেত্রীর পক্ষে তখনকার দিনের অর্থাৎ আজ হতে ৯০ বৎসর পূর্বের ৫০ হাজার টাকার মোহ পরিত্যাগ করা কম গৌরব ও কৃতিত্বের বিষয় নয়। ঠাকুরের আশীর্বাদ, নটগুরু মহাকবি গিরিশের শিক্ষা-গুণে বিনোদিনী আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রইলেন। ঠাকুরের আশীর্বাদ ও কৃপায় বিনোদিনী ভক্তিমতী অভিনেত্রীতে রূপান্তরিত হলেন। নিরক্ষর লাটু—লাটু মহারাজে পরিণত হলেন ; গিরিশের ন্যায় লোক ঠাকুরের ছোঁয়ায় ও কৃপায় ভক্তিমান মহাকবিতে পরিণত হলেন। অখ্যাত অজ্ঞাত এক পাগলী প্রকৃত ভক্তিমতী পাগলিনীতে পরিবর্তিত হোল। তাই ঠাকুর বিদ্যার অভিনয়কারী ছোকরাকে প্রশংসা করে বললেন, বেশ করেছ তুমি। তারপরই ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, শোন, যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে পটু হয়—যে কোন বিদ্যায় যদি সে দক্ষ হয় তাহলে চেষ্টা করলে সে সহজেই ঈশ্বর লাভ করতে পারে।

ঠাকুরের কথা শুনে ছোকরা চমকে উঠে বলল, আমি তো ভাল অ্যাকটিং করতে পারি, আমার পক্ষে ঈশ্বর লাভ সম্ভব ?

ছোকরার কথা শুনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, তা ছাড়া আবার কি? কত অভ্যাস করেই না গাইতে বাজাতে শিখেছ, কত লাফ্-ঝাঁপ্ করেই না রপ্ত করেছ নাচ, সেই অভ্যাস যোগেই লাভ হবে ঈশ্বর।

কী চমৎকার উপদেশ ঠাকুরের! তুমি নাচ, গাও, বাজাও, অ্যাকটিং কর কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, উপর উপর অভ্যাস করলে চলবে না, রীতিমত অভ্যাস কর; আর এই অভ্যাসের নামই হোল সাধনা। এই অভ্যাস যোগের ফলেই হবে ঈশ্বর লাভ। তোমার নাম গোত্র কি জানি না, তোমার কি জাত, তোমার পিতা-মাতা আছে কি নাই জানি না বা আমার জানবার প্রয়োজনও নাই—তুমি সাধন-মার্গে উঠেছ, তুমি ভাল গাইতে বাজাতে পার এই যথেষ্ট, অপর খোঁজে আমার প্রয়োজন নাই। আম খেতে এসেছ—আম খাও; কার বাগান, কত গাছ—এ খোঁজে তোমার দরকার কি? ঠাকুরের কাছে সকলেই শিব এবং সত্যময় ও বিষ্ণুময় জগৎ। ঠাকুরের কাছে চণ্ডীদাসের ন্যায় "শুন রে মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" এই ভাবধারা পূর্ণমাত্রায় ছিল বলেই নামগোত্রহীনা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে এবং বিধুকীর্তনওয়ালীকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ ও প্রতিনমস্কার করতে পেরেছিলেন। কেবল তাই নয়, যাত্রার দলের ছোকরার সাথে ধর্মতত্ত্বের কথা কইতে একটুও কার্পণ্য করেন নাই।

অপর অপর যুগে তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু পাঁচশতবর্ষ পূর্বে ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অস্ত্র-শস্ত্রের পরিবর্তে প্রণাম রূপ অস্ত্র এবং শিবজ্ঞানে জীবের পূজা রূপ মহাঅস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। মহাপ্রভু অমানীকে মান দিতেন এবং পাপী-তাপীর মধ্যে প্রেম বিতরণ করতেন এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণও পতিত উদ্ধারের জন্য এসেছেন জেনে গিরিশ বলতেন—"এমন পাপ নেই যা এই

জ্বলন্ত দেব চরিত্রের সংস্পর্শে অচিরে ভস্মে পরিণত না হয়। তাই গিরিশ সাহঙ্কারে বলতেন, তুমি আসবে আগে জানলে আরো বেশী করে **অপচার** করে নিতুম। ঠাকুরের কাছে আরও শুদ্ধ সত্ত্ব ছেলেরা এসেছিল—আর এমন পাপ নেই যা আমি করিনি, তবু তিনি আমায় গ্রহণ করেছিলেন···তিনি কিছু নিষেধ করেন নি—সব আপনি ছুটে গেল।" গিরিশের নির্ভরতা, বিশ্বাস ও সরলতা দেখে দয়াল ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি যা করেছ তাই কর। এতেও লোক-শিক্ষা হবে। এরি জন্য তিনি জগন্মাতার চরণে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেন গিরিশ প্রভৃতি কয়েকজনকে লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি দেন। জগন্মাতাও ঠাকুরের সেই প্রার্থনা শুনে গিরিশ, নরেন, শ্রীম প্রভৃতি ভক্তদের এমন শক্তি দিয়েছিলেন যদ্দ্বারা তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের যত্র জীব তত্র শিব ও যত মত তত পথের বাণী বিশ্বমাঝে প্রচার করে গেছেন। তাই মহাপ্রভু পাঁচশত বৎসর পূর্বে লোক-শিক্ষার জন্য বলেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন
তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মান দেন
কীর্তনীয় সদা হরিঃ।

মহাপ্রভু এবং পরমহংসদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিল প্রণাম ও মানী অমানীকে মান দেওয়া—যার জন্য এঁদের পদতলে সর্বস্তরের মানুষ ভাই ধর্মের কথা শুনতে এসে নিজেদের ধন্য মনে করতেন।

যত্র জীব তত্র শিব ও ব্রহ্মমতবাদ

(মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সঙ্গে)

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে এসেছেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার, যিনি জায়াকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, যিনি ভক্তিযোগ পুস্তক রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, যিনি বরিশাল জিলার দস্যু, পতিত এবং তৎসঙ্গে যুবকদের মধ্যে সততা, দেশাত্মবোধ, নিয়মানুবর্তিতা এবং শিবজ্ঞানে নরদেবতার সেবাব্রত প্রচার করেছিলেন,--যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় জনৈক মুচির কলেরার সময় এবং অপর এক নিম্ন জাতের লোকের বসন্ত রোগের সময় নিজে সেবা করেছিলেন, যিনি মন্ত্রী ও মহামন্ত্রী হবার প্রলোভনকে চেপে রেখে দেশের অর্থাৎ নিজ জিলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই পূতচরিত্র অশ্বিনী দত্ত রামকৃষ্ণকে দেখতে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। কিন্তু কে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তা তিনি জানেন না। জিজ্ঞাসা করলেন অপর একজনকে—তিনি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, আহা! দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন। এই কথা শুনে অশ্বিনী মনে মনে ভাবছেন, ঐ তাকিয়া ঠেস্ দেওয়ার নমুনা নাকি? তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়ে কিভাবে বসতে হয় তাও জানেন না দেখছি।

তখন কেশব সেন জীবিত আছেন। তিনিও এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, এসে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, ঠাকুরও তাঁকে প্রতিনমস্কার করলেন ও ভাবসমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। ঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থা দেখে গিরিশ ও ডাঃ মহেন্দ্রলালের ন্যায় অশ্বিনীও "ঢং" বলে মনে করলেন। মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির ন্যায় অশ্বিনীও বড় একটা হেজিপেজী লোক ছিলেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, সাধনা, তৎসঙ্গে ছিল তাঁর

অঢেল অর্থ, নিজেও ছোটখাট একটা জমিদার। অশ্বিনী দত্তেরও অহংকার ছিল বৈকি। তবে মহেন্দ্রলালের ন্যায় অত দর্পী ছিলেন না। আরম্ভ হোল কীর্তন। ঠাকুর কীর্তনের তালে তালে নাচতে সুরু করলেন, তাঁর সঙ্গে কেশব ও অপরাপর ভক্তমণ্ডলীও কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। অশ্বিনী এরূপ ভাবগম্ভীর নৃত্য জীবনে কখনও দেখেন নাই, এমন কি কল্পনাও করতে পারেন নাই কোন দিন। যেন মহাকাশে নক্ষত্রের নৃত্য, সূর্যও নাচছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রহ তারা নক্ষত্রও নাচছে; নিজে নেচে সকলকে নাচাচ্ছেন।

অশ্বিনীর ভুল ভেঙ্গে গেল এই অদ্ভুত নৃত্য দেখে। এখন তাঁর মনে এই ধারণা হয়েছে যে, ইনিই গদাধর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এবার অশ্বিনীর অহংকারের কঠিন গাঁটগুলি ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। কীর্তনানন্দের পর অশ্বিনীর এই ধারণা হোল—রামকৃষ্ণ আচ্ছাদিত বহ্নি, দীপিত অগ্নি এবং সূর্যদেব স্বয়ং; ইনিই পরম আয়ু এবং পরমধন প্রদাতা।

অন্য একদিন ঠাকুর অশ্বিনীকে একটা লেমোনেড কিনে আনতে বললেন, ঠাকুরের কথায় সেই কথাটা বর্ণনা করা প্রয়োজন। ঠাকুর বালকের ন্যায় অশ্বিনীকে বললেন, ওগো—সেই যে কাক্ খুললে ভস্ ভস্ করে উঠে একটু টক, একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পারো?

অশ্বিনী বললেন, লেমোনেড? খাবেন?

আবদেরে গলায় ঠাকুর বললেন,—আনোনা একটা।

একটা লেমোনেড এনে দিলেন অশ্বিনী, পরমানন্দে পান করছেন ঠাকুর।

অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জাত মানেন? আপনার জাতিভেদ আছে?

ঠাকুর বললেন, কৈ আর আছে? কেশব সেনের বাড়ী চচ্চড়ি খেয়েছি।

এর পর অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন, কেশব কেমন লোক?

ঠাকুর হৃষ্টচিত্তে বললেন, ওগো সে যে দৈবী মানুষ। এর পরই পূর্ব কথার জের টেনে ঠাকুর অশ্বিনীকে বললেন, জাতিভেদ জোর করে টেনে ছিঁড়তে চেয়ো না, ও আপনা আপনি খসে যায়, যেমন নারকেল গাছের বেল্লো, আপনি খসে পড়ে—তেমনি। এই দেখনা, সেদিন একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক বরফ নিয়ে এসেছিল, এত বরফ ভালবাসি অথচ ওর থেকে কিছুতেই খেতে ইচ্ছা হোল না, আবার একটু পরে আর একজন তারি কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল আর ক্যাচ্ড়্ ম্যাচ্ড়্ করে খেয়ে ফেললাম চিবিয়ে।

এখানে ঠাকুরের দুই ভাবধারা একই সঙ্গে জাগরিত হয়েছিল, সামাজিক অনুশাসন ও শিবজ্ঞানে জীবদর্শন। দেব-মানব ঠাকুরের নিকট সামাজিক অনুশাসন মুহূর্তমাত্র স্থান পেল না—শিব দর্শনই প্রবল হয়ে দাঁড়াবার ফলে পুনঃ সেই লম্বা দাড়িওয়ালার বরফই কিনে খেলেন দ্বিধাহীন চিত্তে।

অশ্বিনী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ত্রৈলোক্যবাবু কেমন লোক? ঠাকুর বললেন—ত্রৈলোক্য? আহা বেশ লোক, বেড়ে গায়।

সেদিন ত্রৈলোক্যও দক্ষিণেশ্বর এসেছেন ঠাকুরকে গান শোনাতে। মা'র গান ধরেছে ত্রৈলোক্য—

মা! তোমার কোলে নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে
আমায় বুকে করে রাখ · ···

গান শুনে প্রেমে কাঁদছেন ঠাকুর। আহা! কী ভাব!

ত্রৈলোক্য পুনঃ গান ধরলেন—

আপনি বাজাও তালে তালে
মানুষ তো সাক্ষীগোপাল
মিছে আমার আমার বলে॥

গান শুনে ঠাকুর গদগদ হয়ে বললেন, আহা! তোমার কী গান! তোমার ঠিক ঠিক গান।

যে সমুদ্রে গিয়েছে সে দেখতে পারে সমুদ্রের জল। গানের শেষে ত্রৈলোক্য বললেন, আহা! ঈশ্বরের রচনা কী সুন্দর!

ঠাকুর বললেন, দপ্ করে দেখিয়ে দেয়, হিসাব করে সুন্দরের বোধ আসে না।

ঠাকুর বললেন, সেই সেদিন শিবের মাথায় ফুল দিচ্ছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে এই বিশ্বসৃষ্টিই 'এই বিরাট মূর্তি শিব', তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হল; ফুল তুলছি, হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যেন ফুলের গাছগুলিই এক একটি ফুলের তোড়া, সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল ফুল তোলা। মানুষকেও সেই রকম দেখি, তিনি যেন মানুষের শরীরটাকে নিয়ে হেলে দুলে বেড়াচ্ছেন, যেন ঢেউএর উপর একটা বালিশ ভাসছে, নড়ছে, চড়ছে, উঠছে পড়ছে।

কী অপূর্ব বক্তব্য ও অনুভূতি! ঠাকুর অনুভব করলেন—শিব তৈরী করে পূজার আর প্রয়োজন নেই, কারণ পৃথিবীর অণুপরমাণু থেকে মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত সকলই তো শিব, সুতরাং শিব তৈরী করে পূজার কোন প্রয়োজন নেই, শিবজ্ঞানে জীবের সেবাই প্রকৃত পূজা। বৃক্ষ থেকে পুষ্পচয়নেরও কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ঠাকুর প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন ফুলের গাছগুলিই এক একটি ফুলের তোড়া হয়ে বিরাজমান। এই দর্শনের পরই পরমহংসদেব ফুল তুলে পূজা বন্ধ করে দিয়ে সমাধির আনন্দেই মাতোয়ারা হতেন। তাঁর সম্মুখে, পশ্চাতে ঊর্ধ্বে অধঃ দক্ষিণে বামে দেখতে পেতেন শিব এবং শিবময় জগৎ। পুষ্প যেমন শিব, বৃক্ষ তদ্রূপ শিব —জগৎময় শিবই যখন প্রত্যক্ষ করতেন তখন তাঁর পুষ্পস্তবক দ্বারা পূজার কোন প্রয়োজন রইল না। ঠাকুর মানুষকেও শিবরূপে দর্শন করছেন, শিবরূপী মানব যেন শিবের ন্যায় হেলে দুলে চলছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে মানুষের মধ্যে কেউ সত্ত্বগুণসম্পন্ন, কেউ রজ আবার কেউ তমগুণসম্পন্ন মানুষও তো আছে, তবে ঠাকুর সকলের মধ্যে শিব দর্শন কিভাবে করলেন? ঠাকুর তো বহুবার

বহুভাবে বলেছেন, সংসারী জীব মাছির ন্যায়, কখনও সন্দেশের থালায় বসে, কখনও পচা ঘায়ে বসে। ঢেউএর উপর বালিশ ভাসছে, নড়ছে চড়ছে পড়ছে দুলছে—এসমস্তই শক্তির খেলা। সংসারী লোক ঠিক ঢেউএর বালিশের ন্যায় কখনও উপরে উঠে আবার কখনও নীচে নামে অর্থাৎ উত্থান পতন তাদের থাকা সত্ত্বেও তারা শিব। আর সংসারী লোক যখন ভগবানের নাম করে তখন তারা বীর-ভক্ত, সন্ন্যাসী ভগবানের নাম করবে তাতে আর বাহাদুরী কি? সংসারী জীবের উত্থান পতন আছে তত্রাচ তারা শিব, অতএব তারা প্রত্যেকেই পূজার যোগ্য।

মানবদরদী ঠাকুর যে মানবের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা করতেন ও ব্যাকুল হতেন তা লাটু যখন এক গৃহী ভক্তের অসভ্যতা দেখে ভর্ৎসনা করলেন—তাতেই দেখা যায়। ঠাকুর সেই ভর্ৎসনা শুনে লাটুকে বলছেন, এখানে যারা আসে তাদের ওরকম কড়া কথা বলতে নেই। একে তো তারা সংসারের জ্বালায় জ্বলছে, এখানে এলে তাদের বেয়াদবীতে যদি তোরা এত কড়া কথা বলে দুঃখ দিবি তা হলে তারা যায় কোথায় বলতো?

এর পর ঠাকুর সেই ভক্তের বাড়ীতে লাটুকে দুবার পাঠিয়েছিলেন, একবার সংবাদ নিতে আর একবার ঠাকুরের প্রণাম জানাবার জন্য। প্রণামের কথা শুনেই ভক্তটি কেঁদে আকুল হলেন। ঠাকুরের উপদেশ ও কথামৃতের মধ্যে আছে মানবদরদের কথা, তাদের শিবজ্ঞানে পূজার কথা। তাই তিনি প্রত্যেক মানুষকে শিবজ্ঞানে পূজা করতেন।

সেদিন ঠাকুরের কথার মাঝখানেই অশ্বিনী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, শিবনাথ কেমন লোক?

ঠাকুর বললেন, বেশ লোক! তবে তর্ক করে যে! তবে শিবনাথকে দেখলে আনন্দ হয়—কেন জান? গাঁজাখোরের স্বভাব গাঁজাখোরকে দেখে ভারি সুখী, হয় তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে

বসে। যে অনেক দিন ঈশ্বরচিন্তা করে—তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায় তার মধ্যেও ঈশ্বরের শক্তি আছে; যার যতটুকু বিদ্যা তার ততটুকু বিভূতি। ঈশ্বরই সংসারোত্তর মন্ত্র, তাই যার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র তারই জন্ম সফল।

কথাপ্রসঙ্গে অশ্বিনী অচলানন্দের কথা বলায় ঠাকুর বললেন, কেমন লাগলো তাকে?

অশ্বিনী বললেন—চমৎকার।

ঠাকুর ছোট ছেলেদের ন্যায় বলে উঠলেন, আচ্ছা বলতো, সে ভালো না আমি ভালো?

অশ্বিনী বললেন, কার সাথে কার তুলনা? সে হোল গিয়ে পণ্ডিত লোক আর আপনি হচ্ছেন মজার লোক। আপনার কাছে শুধু মজা, হরেক রকম মজা, অফুরন্ত মজা!

অশ্বিনীর কথা শুনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন,—বেশ বলেছো, ঠিক বলেছো! মজার লোক।—তুমি সর্বসুখনিলয়, তুমি আছ হাসে ও রসে, আনন্দে ও বিনোদে। সুখের বিষয় 'বিষয়' নয়, সুখের বিষয় 'আত্মা', খণ্ড সুখ ক্ষুদ্র সুখ নিয়ে কি হবে? যে সুখ বারে বারে মরে যায় সে সুখের মূল্য কি? চাই অবিনশ্বর সুখ, সেই সুখেই তুমি সুখী।

অশ্বিনী ঠাকুরের কথা শুনে বলেছেন, তাঁকে পাব কিভাবে?

—কাঁদতে কাঁদতে কাদাটুকু যখন ধুয়ে যাবে তখন পাবে। চুম্বক বরাবরই লোহাকে টানে কিন্তু লোহার গায়ে কাদা লেগে থাকলে কি করে টানে চুম্বকে? তাই কাদাটুকু ধুয়ে ফেল চোখের জলে। এই কথা বলে ঠাকুর তাঁর তক্তোপোষের উপর উঠে শুয়ে পড়লেন।

একটু পরেই অশ্বিনীকে বললেন, বড্ড গরম গো, হাওয়া কর দেখি—পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাওনা।

—আপনারও সৌখ আছে দেখছি?

হেসে পরমহংসদেব বললেন, কেন থাকব না, কেন থাকবে না?

বললো অশ্বিনী, না! না! থাক্—একশোবার থাক। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর অশ্বিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি গিরিশ ঘোষকে চেন?

—কোন্ গিরিশ ঘোষ?

ঠাকুর বললেন—থিয়েটার করে যে?

—দেখিনি কখনও, নাম শুনেছি।

ঠাকুর অশ্বিনীকে বললেন, আলাপ করো তার সঙ্গে, খুব ভাল লোক।

অশ্বিনী বললেন, শুনি মদ খায় নাকি?

অশ্বিনীর কথা শুনে ঠাকুর বললেন, তা খাক্‌না, খাক্‌না; কত দিন খাবে? জান, গিরিশ এখন কি বলছে? এখন ঠাকুরের কথায় যে আনন্দ পাই, তার এক কণাও যদি মদ, ভাঙ, গাঁজায় থাকত? গিরিশ বলে, 'আমি পরমহংসদেবকে কত কি বলতাম, তিনি কিছুতেই বিরক্ত হোতেন না, যখন মদ খেয়ে টং হয়ে যেতাম তখন তো তাঁর কাছে আশ্রয় পেতাম, সে অবস্থায়ও আদর করে ধরে নিয়ে যেতেন, লাটুকে বলতেন—ওরে ছাখ, গাড়ীতে কিছু আছে কিনা? এখানে খোয়ারী এলে তখন কোথায় পাব? তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতেন। চেয়ে থেকে আমার চোখের দৃষ্টি সাদা করে দিতেন। শেষে আপ্‌সোস করতাম, আমার আস্ত বোতলের নেশাটা মাটি করে দিলে?' গিরিশ আমার মুখের উপরেই বললে, 'সব বিষয়েরই গুরু আপনি, এমনকি ফচ্‌কেমিরও।'

ঠাকুরের কথা শুনে অশ্বিনীর ভুল ভাঙ্গল, কারণ গিরিশ সম্বন্ধে অশ্বিনীর যে ভুল ধারণা হয়েছিল তা ভাঙ্গবার জন্যই ঠাকুর অশ্বিনীকে গিরিশের কথাগুলিই সুন্দর ভাবে বললেন।

আর একদিন অশ্বিনী এসেছেন ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর তখন ভাবমুখে ছিলেম। ঐ অবস্থায়ই অশ্বিনী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ব্রাহ্মধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রভেদ কি?

ঠাকুর অতি সরলভাবে বললেন, সানাই বাঁশী বাজাবার রীতি জান তো? দুজন সানাইদার, একঠাঁই দুজনে দুখানা সানাই নিয়ে বসে, একজন পোঁ ধরা; তার একসুর, এ ব্রাহ্মধর্ম। আর অপর হিন্দুয়ানী, সে নানা রাগ-রাগিণী বাজায়! বলে ঠাকুর যতবিধ ধর্ম আছে তাদের উদ্দেশে নমস্কার জানালেন। আজকাল যে ব্রাহ্মধর্মের এত ছড়াছড়ি তাকেও করলেন নমস্কার।

এই ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণকুলতিলক প্রাতঃস্মরণীয় রামমোহন রায়। তাই অনেকের মনে সতত এই প্রশ্ন জাগরিত হতে পারে, ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্ম বিদ্যমান থাকতে এবং নিজে হিন্দু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে, পুণ্যশ্লোক রামমোহন একটা নূতন ধর্মের পত্তন করলেন কেন? এর গূঢ় উদ্দেশ্য কি ছিল? এই রামমোহনই সতী-দাহ প্রথা নিবারণে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি-স্থাপনে, অসবর্ণ বিয়ে চালু করতে এবং ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তন আন্দোলনের মূলাধার ছিলেন। এর জন্য রামমোহনকে কম নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় নাই তাঁর আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজাতির দ্বারা। কিন্তু সত্যজিৎ রামমোহন জয়ী হলেন, তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোল।

রামমোহনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করা। রামমোহনের দিব্য-দৃষ্টি যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল তা তৎকালের ভারতবাসী ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নাই, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝা যাচ্ছে রামমোহনের দূরদৃষ্টির কথা। বহু-কুসংস্কার ও গোঁড়ামিপূর্ণ হিন্দু-সমাজকে ও সনাতন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবার জন্য রাজনীতিতে পরাজিত হিন্দুদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রচেষ্টা করেন। সমুদ্র পার হওয়া হিন্দুদের ঘোরতর অন্যায়—এ ধারণা দূর করবার জন্য নিজে রাজদূতরূপে লণ্ডনে গমন করে দেশবাসীকে দেখিয়ে যান—শিক্ষা ও কাজের জন্য এবং জ্ঞানলাভের জন্য সাগরপারে যাওয়া চলে, তাতে কোন পাপ নেই। হিন্দুধর্মের মধ্যে

বহু কুসংস্কার ও গোঁড়ামি লোপ করবার জন্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে শিক্ষিতের দল খ্রীষ্টান না হয়ে ব্রাহ্ম হবার জন্য অগ্রসর হতে থাকেন। রামমোহন তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের মধ্যে হিন্দুদের গায়ত্রী, বেদান্ত এবং তাঁর পিতৃ-পিতামহের ধর্মের মধ্যে যা কিছু ছিল মহান্, যা কিছু ছিল শুভ তা তিনি সংরক্ষণ করে নব-ধর্মের মধ্যে সংযোগ করে দিয়েছিলেন। এমন কি হিন্দুধর্মমতে ধ্যান-পদ্ধতিও তিনি ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে প্রবর্তন করে গিয়েছেন। মহানির্বাণ-তন্ত্রের কয়েকটি স্তব, উপনিষদের মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যা তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-সমাজে চলতো। এই সমস্ত মহৎ কার্যাবলীর জন্য রামমোহন দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা উপাধি লাভ করে রাজদূতরূপে ইংলণ্ড রওনা হয়েন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন মহাপ্রস্থান করেন। রামমোহনের জীবনী-লেখিকা কুমারী এস, সি, কোলেট বলেন—"রাজা রামমোহন পুরাতন ইংলণ্ডের গর্ভ থেকে নবীন ইংলণ্ডের জন্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এরি মধ্যে তিনি নব-ভারতের সাথে নবীন ইংলণ্ডের প্রথম পরিচয় লাভ করান।" রামমোহনের ইংলণ্ড পরিদর্শনের ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। কুমারী কোলেটের কথার সাক্ষী পাওয়া যায় স্বামী বিবেকানন্দের কথায়। স্বামীজী বলেন—আজ ভারতে যে ক্ষুদ্র প্রাণ-স্পন্দন ও কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে তা সেদিন আরম্ভ হয়েছে যেদিন রামমোহন জাতীয় বিধিনিষেধের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে সাগরপারে গিয়েছিলেন—ভারতকে বিভিন্ন উপায়ে সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ করবার জন্য। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি রামমোহনের দেশপ্রীতি উজ্জ্বল ছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজ যেরূপ ভাবে আস্তে আস্তে ইংরেজ ভাবাপন্ন হয়ে যাচ্ছে তাতে শিক্ষিত যুবক সমাজ খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করতে পারে— এইচিন্তা রাজার মনে জাগরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট ব্রাহ্মধর্ম স্থাপন করেন এবং তাঁর নব-প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে ভারতের অতি গৌরবময় হিন্দুধর্মের উচ্চভাবধারা-

গুলি সংযোগ করলেন। সংবাদে প্রকাশ—মৃত্যুকালে রাজা হিন্দুদের পবিত্র ওঁ ধ্বনি উচ্চারণ করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুণ্যশ্লোক রাজা রামমোহন হিন্দুধর্মের মর্মবাণী গ্রহণ করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে সেইগুলি প্রবর্তন করেছিলেন বলেই শিক্ষিত হিন্দুদল খৃষ্টান না হয়ে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হতে আরম্ভ করেন এবং এর জন্যই খৃষ্টধর্মের গতিপথ প্রশস্ত হতে পারে নাই। রামমোহন যদি এরূপ-ভাবে দেশের ভবিষ্যৎ চিত্র দেখে তাঁর মত প্রকাশ না করতেন তবে ভারতবর্ষের কুসংস্কারগুলির যবনিকা পতন হত কিনা বলা যায় না।

রামমোহনের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে শ্রীশ্রীগদাধর জন্মগ্রহণ করেন এবং রামমোহনের অসমাপ্ত কার্য তিনি বাস্তবে রূপায়িত করবার ব্রত গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মকে এক মহান ধর্মে রূপান্তরিত করে তাঁর প্রিয় সন্তান নরেনের কানে দেন সেই ধর্মের "মূলমন্ত্র"। "যত্র জীব তত্র শিব —যত মত তত পথ" এই হল রামকৃষ্ণের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দিলেন রামকৃষ্ণের প্রিয় সন্তান বিবেকানন্দ বেদান্ত শিক্ষার মাধ্যমে। সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হয়েছিল তাঁর জলদগম্ভীর নিনাদে। বিনা রক্তপাতে, বিনা অর্থে ও বিনা সহায়ে কেবলমাত্র গুরুর কৃপায় ও তদীয় পাণ্ডিত্যবলে বিবেকানন্দ অর্ধ পৃথিবী জয় করতে পেরেছিলেন যা আর কোন ধর্মপ্রচারক নিজের জীবনে এরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নাই। স্বামীজীর অসমাপ্ত কার্য সুসম্পন্ন করেন তাঁর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ, দীর্ঘ ২৫ বৎসর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে বেদান্তের বাণী প্রচার করে। রাজা রামমোহন প্রবর্তিত পথ তাঁর অনুগামীবৃন্দ প্রশস্ততর না করে অল্প দিনের মধ্যেই তাকে করে ফেললেন সংকীর্ণ। কারণ রামমোহন হিন্দুধর্মের যা কিছু মহান ও গরীয়ান ছিল তা গ্রহণ করেছিলেন; পৈতা ত্যাগ ও গায়ত্রী মন্ত্র ত্যাগ ইত্যাদি রামমোহন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের মধ্যে কোথাও নিষেধ করেন নাই বা তিনি ঐগুলি পরিত্যাগ করতেও কোথাও বলেন নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে রামমোহনের

স্থানে যিনি ব্রাহ্ম আচার্য হয়েছিলেন সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির পীড়াপীড়িতে পৈতা ত্যাগ করে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে একটা বিস্তৃত ব্যবধানের সৃষ্টি করেন। তবে আদি ব্রাহ্ম সমাজে দেবেন্দ্রনাথ কতগুলি হিন্দু রীতিনীতি রক্ষা করেন এবং উপনিষদও তিনি গ্রহণ করেন ও উপনিষদের আলোকে দেবেন্দ্রনাথ নিজ ধর্মজীবনের পুষ্টিসাধনও করেন। কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং তাঁদের দলীয় ভক্তবৃন্দ ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দুসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্ম-বিশ্বাস খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় গড়ে উঠলো এবং যিশুখৃষ্টকে অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করে হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টান, মুসলমান ও চৈনিক শাস্ত্র থেকে শ্লোকাবলী সংগ্রহ ও সংকলন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্ত প্রতাপ মজুমদার বলেন, নিজ ধর্মমতকে বিশ্ব ধর্মমতে পরিণত করবার জন্য কেশব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এবং চৈনিক শাস্ত্রসমূহ থেকে বাক্যাবলী সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারপর প্রতাপ মজুমদার বলেন, হিন্দু ধর্মকে ও শাস্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করবার পর থেকেই সংকলিত গ্রন্থই ব্রাহ্ম সমাজের দর্শন ও মতবাদ হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ এই সর্বনাশা ব্যাপার পরে বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু এমন সময় তাঁরা বুঝেছিলেন যে, তখন আর সংশোধনের কোন পথ ছিল না। পণ্ডিত সতীনাথ তর্কভূষণ অত্যন্ত মর্মপীড়িত হয়েই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় বলেছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজে বেদান্তবাদ অগ্রাহ্য হওয়া এক মহাভ্রান্তি। ইহাই ব্রাহ্ম সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছে ও করছে। এই ভ্রান্ত ও কৃত্রিম মতই ব্রাহ্ম সমাজকে ধ্বংসের পথে টেনে এনেছে।

ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ নানারূপ আলাপ আলোচনা ও সাধন করেও যখন অন্তরে শান্তি পেলেন না তখন ব্রাহ্ম নেতৃবৃন্দ কেশব, বিজয়, প্রতাপ, শিবনাথ, ত্রৈলোক্য এবং যুবকদের মধ্যে নরেন, রাখাল,

শশী, সারদা, মাষ্টার প্রভৃতি একে একে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কথামৃত শুনতে ও তাঁকে দর্শন করতে হাজির হতে লাগলেন।

তবে একথা স্বীকার করতেই হবে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় দোষ-ত্রুটী যা-ই প্রবিষ্ট হোক না কেন এই ধর্ম তৎকালীন হিন্দুধর্মের অন্ধকারময় আবহাওয়া থেকে তার সামাজিক সংস্কারকে জনপ্রিয় করেছে। যে সকল শিক্ষিত ভারত-সন্তান খৃষ্টান হতে মনস্থ করেছিলেন তাঁদের গতিপথ রোধ করে দিয়েছে ব্রাহ্ম ধর্ম, তাতে কোনো সন্দেহ নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে হিন্দুধর্ম গতিশীল ও উদার হতে পেরেছে ; যার ফলে বিলাত যাত্রা, নারী জাগরণ ও স্ত্রী শিক্ষা, অবাধ মেলামেশা ও অস্পৃশ্যতার ভয় দূর হয়েছে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলেই হিন্দুদের মধ্যে যত কিছু গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ছিল সেগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে মনীষী রামমোহন যদি ব্রাহ্ম ধর্ম স্থাপন না করতেন তা হলে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে তরুণ বঙ্গের মনকে অতীত যুগের কু-সংস্কার থেকে মুক্ত করা সহজসাধ্য হত কিনা সন্দেহ। তরুণ বঙ্গ নবীন আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথের' কথায় অতি সহজে যোগ দিতে পারতেন কিনা ভাববার বিষয়। যত মত তত পথের প্রবর্তক রামকৃষ্ণ অনুভব করতে পেরেছিলেন পৃথিবীর গতিপথ, তাই তিনি "যত্র জীব তত্র শিব ও যত মত তত পথের" অভীমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন নরেন, রাখাল, শশী প্রভৃতি একাদশ ঈশ্বরকোটি ভক্তমণ্ডলীকে। গুরুদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে বলীয়ান হয়ে নরেন, দেখতে পেলেন অন্যান্য ভণ্ডের দল পরাবিদ্যার (ছলনার) মুখোস পরে অবিবেক, অবিচার প্রভৃতি অবিদ্যাকে ধর্মের ভেতর টেনে এনে সমাজের মধ্যে একটানা ভণ্ডামী চালিয়ে যাচ্ছে, তখন চেতনার চাবুক দ্বারা বিবেকানন্দ তাদের মুখোস খুলে দিয়েছিলেন। গুরুর নির্দেশে নরেন, রাখাল প্রভৃতি শিবজ্ঞানে জীবের শুধু সেবা নয়, পূজা করতে

সমর্থ হয়েছিলেন বলেই তাঁরা হাতে নিয়েছিলেন ভালবাসার বল্‌গা, যার ছোঁয়ায় যুগ-যুগান্তের কুসংস্কারগুলি দেশ ছেড়ে উড়ে পালাল এবং জাত্যাভিমানের হল পাতাল প্রবেশ। তবে একথা সত্যি যে, তখন ব্রাহ্ম সমাজের উত্থান না হলে হিন্দু সমাজের মধ্যেও একটানা জাগরণের ঢেউ আসতো না। রাজা রামমোহনের কার্যধারা অনুধাবন করলে মনে হয় তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে একটা সুসংস্কৃত উচ্চাঙ্গের হিন্দু ধর্ম যার মধ্যে গোঁড়ামি, ভণ্ডামী, কুসংস্কার ও নীচতা প্রভৃতি থাকবে না। তিনি অগ্রসরও হয়েছিলেন অনেক দূর কিন্তু কালের কুটিল চক্রে তিনি অকালে ঝরে পড়লেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অসমাপ্ত কার্য তাঁর পরবর্তী ব্রাহ্ম নেতারা সুসম্পন্ন তো করলেনই না অধিকন্তু খৃষ্টান মিশনারীদের ন্যায় তাঁরাও নানা ভাবে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করতে লাগলেন। তারপর ব্রাহ্মসুধীবৃন্দ অনুমান করেন, ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব ও বেদান্তবাদ অগ্রাহ্য করাই হল হিন্দু বাঙ্গালীর অসমর্থনের কারণ। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর তিন বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে শ্রীশ্রীগদাধর আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলামায়ের ক্রোড়ে কামারপুকুর নামক এক গণ্ডগ্রামে। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব না হলে হিন্দুধর্মের মহিমা আজ জগৎসভায় গীত হত কিনা সন্দেহ। তিনি তথাকথিত পুঁথির বিদ্যার উপর নিজেকে দাঁড় না করিয়ে সাধন, ভজন, সমাধি ও ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাণী প্রচার করে সপ্রমাণ করলেন পুঁথিগত বিদ্যার অসারতা। এই অসারতা প্রমাণ করবার জন্যই তিনি সর্বধর্মে সিদ্ধিলাভ করে যত মত তত পথের বাণী প্রচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, আর তাঁর পদতলে বসে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সর্ব মানব শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিলেন। রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের সর্ব শাখা ধর্মের সাধনায় যেমন সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তদ্রূপ তিনি মুস্‌লিম ধর্ম ও খৃষ্টধর্মেও সিদ্ধিলাভ করে মাতৃপূজা থেকে নিরাকার নির্গুণ অদ্বৈত তত্ত্বের উচ্চতম ধ্যান-ধারণায়ও ছিলেন সিদ্ধ। তাই

রোঁমারঁল্যা বলেন—ত্রিশকোটি মানবের দুই সহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিমূর্তি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের একমাত্র কথা ও বাণী ছিল ঈশ্বরই একমাত্র সত্য আর সকল অনিত্য। গান্ধীজী বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাস সর্ব সাধনার অনুভূতির ইতিহাস, তাঁর দেবজীবন আমাদিগকে ভগবান লাভ করতে অনুপ্রাণিত করে। দেবভাবের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন রামকৃষ্ণ, তাঁর উপদেশ কেবল পণ্ডিতের বাক্য নয় পরন্তু তা তাঁর জীবনবেদের জীবন্ত বাণী। এই বাণীগুলি দেবমানব রামকৃষ্ণের নিজ অনুভূতিপ্রসূত, সেই জন্যই ঐগুলি সকলের মনে অপ্রতিহত প্রস্তাব বিস্তার করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন ও প্রকৃত জ্ঞান লাভ যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন ব্রাহ্ম নেতারা তৎসঙ্গে তরুণ বঙ্গের সকল সম্প্রদায় থেকে প্রকৃত সত্যানুরাগীবৃন্দ দলে দলে দক্ষিণেশ্বর আসতে লাগলেন; ব্রাহ্ম নেতাদের অগ্রগামী কেশব সেন আর তরুণ সন্ধানীবৃন্দের অগ্রগামী ছিলেন নরেন দত্ত। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইউরোপীয় ভাবধারায় গঠিত নরেন্দ্রনাথ এবং তরুণ বঙ্গের শিক্ষিত ব্রাহ্ম যুবকবৃন্দ রামকৃষ্ণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কেবল হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবানই হন নাই—হিন্দু সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হয়ে বেদান্ত দর্শন ও রামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত যত মত তত পথের বাণী পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রচার করতে এগিয়ে এলেন। তাই ফরাসীর প্রখ্যাত লেখক রোঁমারঁল্যা প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলেন, এই ভাবে সরল রামকৃষ্ণের চরণে অভিজ্ঞানী, অতি উদ্ধত, বর্তমান ভারতের মহান ধর্মচেতনায় গর্বিত সকলেই আত্মনিবেদন করেছিলেন। দেবমানব রামকৃষ্ণের জীবনের মধ্য দিয়ে দিব্য আলোক শত শতাব্দীর ঘন অন্ধকার বিনাশ করে তরুণ বঙ্গ তথা তরুণ ভারতকে যথার্থ আলোক প্রদান করেছিল।

ব্রাহ্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন নববিধান ব্রাহ্মমন্দির স্থাপন করেন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, কেশব দেহরক্ষা করেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই ঠাকুরের পূত প্রবল আকর্ষণ-প্রভাবে তাঁর জীবনধারা দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। দর্পী, উদ্ধত, শিক্ষার গরবে গরীয়ান ও হিন্দু দেবদেবী-বিদ্বেষী কেশব প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের নিকট যেতেন কথামৃত শুনতে ও উপদেশাবলী গ্রহণ করতে। ঠাকুরও মাঝে মাঝে যেতেন কেশবের কাছে, না হয় তাঁদের মন্দিরে। ঠাকুরের সাথে আলাপ হবার পর থেকেই কেশব ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য-বেদী, অপরাপর বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে রামকৃষ্ণের অলৌকিক দৈবী শক্তির কথা প্রচার করতে লাগলেন। ঠাকুরের শক্তি-প্রভাবে কেশব ও বিজয় ধীরে ধীরে ভগবানের সাকার রূপে বিশ্বাসী হয়ে মাতৃপূজা সুরু করলেন। এমন কি কেশব 'সানডে মিরর' পত্রিকায় হিন্দুর মূর্তিপূজা একেবারে বর্জনীয় বা উপেক্ষণীয় নয় ব'লে ব্যক্ত করলেন। কেশব বলেন—ভগবানের ৩৩ সহস্র ভগ্নপ্রতীক এতে বিদ্যমান। এমন কি কেশব এবং তাঁর ভক্তমণ্ডলী শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রভাবে নিরাকার ও সাকার ভগবানের একই প্রকৃতস্বরূপ জেনে স্বীয় নববিধান সমাজে উপাসনা-কালে দুর্গাতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—হিন্দুর মূর্তিপূজা বস্তুতে রূপায়িত ভগবানের পূজা। এই দুর্গাতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের সাথে মণি মল্লিকের কথোপকথন ব্যক্ত করলে পর বিষয়টি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন মণি মল্লিক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর কাছে মেঝেতে বসে কথাবার্তা বলার সময় ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পূজার ছুটী হয়েছে? আজ্ঞে হ্যাঁ—বলে মণি পুনঃ বলল—আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়ী প্রত্যহ গিছলাম। ঠাকুর তাই শুনে বললেন, বল কি গো! মণি তদুত্তরে ঠাকুরকে বললেন—(এই কয়দিন) দুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি। ঠাকুর বললেন—কি

বল দেখি? ঠাকুরের অনুমতি পেয়ে মণি বলতে লাগল—কেশব সেনের বাড়ীতে রোজ উপাসনা হয় দশটা এগারটা পর্যন্ত। সেই উপাসনার সময় তিনি (কেশব) দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললেন, যদি মাকে পাওয়া যায়, যদি মা দুর্গাকে কেহ হৃদয়-মন্দিরে আনতে পারে তা হলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি এসব আপনি হ'য়ে যায়—মা যদি আসেন। যে কেশব একদিন খৃষ্টান মিশনারীদের ন্যায় হিন্দু-ধর্মকে কটূক্তি করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই তাঁর এবংপ্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করবার বিষয় নয় কি?

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের মোহ ছেড়ে হিন্দু সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হ'য়ে যখন সনাতন হিন্দুধর্মের ভাবধারা নিয়ে চলার পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং কেশবের যেরূপ দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল তাতে এই কথাটা মনে জাগরিত হওয়া অন্যায় হবে না যে, কেশব আরও কিছুকাল জীবিত থাকলে পর পুরোপুরি তিনিও হয়তো বা হিন্দুতে রূপান্তরিত হতেন, কারণ রামকৃষ্ণের প্রভাবে কেশব হিন্দুভক্তের ন্যায় ধর্মজীবনে হোম, দীক্ষা, গৈরিক বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তাও (তিনি) স্বীকার করে গেছেন, যার নিদর্শন অদ্যাপি নব-বিধান সমাজে দেখা যায়। এখন ব্রাহ্ম আচার্য বৈরাগ্যের চিহ্নস্বরূপ গৈরিক উত্তরীয় ব্যবহার করে থাকেন।

তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এবং বাংলার ডি, পি, আই, শ্রীচার্লস্ এইচ টনি ইম্পিরিয়াল কোয়ার্টারলি রিভিউতে একটি আধুনিক হিন্দু সাধু (A Modern Saint) নামক প্রবন্ধে বলেন—ব্রাহ্ম সমাজের দুই শ্রেষ্ঠ নেতা কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকেও তিনি (রামকৃষ্ণ) গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও অনুরূপ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন

রামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির কথা। তিনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সানডে মিরর পত্রিকায় বলেন, এই মহাপুরুষ যেখানেই যেতেন সেখানেই আপনার চতুর্দিকে একটি জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতেন। আজও আমার চিত্ত সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভ্রমণ করছে। যখনই আমার সাথে তাঁর দেখা হত তখনই তিনি এক অপূর্ব ভাবাতীত ও ভাষাতীত করুণা আমার প্রাণে ঢেলে দিতেন, সেই প্রভাব আমি অতিক্রম করতে পারি নাই। আমি একজন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, অর্ধনাস্তিক, এবং তথাকথিত শিক্ষিত যুক্তিবাদীব্যক্তি, আর তিনি একজন দরিদ্র অশিক্ষিত, মূর্তিপূজক হিন্দু, কেন আমি তাঁর কথা শুনবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পদতলে বসে থাকতাম! শুধু আমিই নহি, আমার ন্যায় বহু ব্যক্তি এরূপ থাকতেন। তাঁর মুখে শিশুসুলভ কোমলতা, অবর্ণনীয় মাধুর্য, হাসি ও শ্রী প্রকটিত হত যা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, ঠাকুরের সার্বজনীন ধর্মভাবই তাঁর একমাত্র পরিচয়। তাঁর ধর্ম কি? গোঁড়া হিন্দুধর্ম? না, এ এক অভিনব হিন্দুধর্ম, তিনি কোন বিশেষ হিন্দু-দেবতার উপাসক নহেন, তিনি শৈব নহেন, বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিকও নহেন, তবুও তিনি এ সকলই। তিনি শিবোপাসনা করেন, কালীপূজা করেন, রামের আরাধনা করেন, কৃষ্ণের বন্দনা করেন, আবার তিনি বেদান্ত ধর্মের একজন একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক। রামকৃষ্ণের নিকট প্রতিটি ধর্ম অভ্রান্ত। তিনি সাকার ও নিরাকার ভগবানের একান্ত অনুরক্ত সাধক। তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে কামজয়ী হওয়া—প্রত্যেক নারীকে জগদম্বার অংশসম্ভূতা বলে ধারণা করতে মা কালী তাঁকে শিখিয়েছেন। এখন তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দেখে থাকেন এবং আপন মাতাকে সন্তান যেরূপ প্রণাম করে থাকেন তদ্রূপ তিনি মাতৃরূপে নারী ও বালিকাদের প্রণাম করেন। নারী-জাতির প্রতি তাঁর সম্পর্ক ও তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অতুলনীয় ও

আদর্শস্থানীয়। কাম-কাঞ্চন-জয়ী তিনি। যিশু ও মহম্মদকে মস্তক অবনত করেন এবং যিশুর সন্তানধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। এর পরই প্রতাপচন্দ্র বললেন, অশিক্ষিত রামকৃষ্ণের নিকট সকলের বিদ্যাভিমান ধূলিসাৎ হয়ে গেল, এই মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের উদারতা ও গম্ভীরতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। রসনাকে তিনি সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন এমন কি প্রায় বিনষ্ট করেছিলেন। ভগবান ব্যতীত তাঁর জীবনে কোন চিন্তা ছিল না, ভগবান ভিন্ন আর কারোর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল না এবং ভগবান ছাড়া অন্য কিছুর তাঁর প্রয়োজনও ছিল না। শেষে তিনি বলেন, যত দিন তিনি (রামকৃষ্ণ) আমাদের সাথে অবস্থান করবেন ততদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে আমরা অলৌকিক পবিত্রতা, অপার্থিব মানবতা, অসাধারণ আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ততা শিক্ষা করে ধন্য হব। প্রতাপ মজুমদারের মন্তব্য দেখে মনে হয়, তিনি রামকৃষ্ণকে দেবমানব বা মহামানব মনে করে ভগবৎকথা শুনবার জন্য তাঁর চরণতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।

তৎকালীন ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি ব্রাহ্মবৃন্দ (শিবনাথও পূর্বে রামকৃষ্ণকে মান্য করতেন) মান্য করতেন, এমন কি আচার্যের বেদী থেকে কেশব তাঁকে জ্ঞানগর্ভ কথামৃত বলতে অনুরোধ করতেন। বিজয় (রামকৃষ্ণ উপস্থিত থাকলে) তাঁর অনুমতি নিয়ে আচার্যের বেদীতে উপবেশন করে বক্তৃতা করতেন। তারপর যে কেশব-বিজয় রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মসমাজে ভজন, কীর্তন ও মায়ের নাম প্রবর্তন করেন, শেষকালে সেই ব্রাহ্মগণ কেন রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন—এই প্রশ্ন স্বতঃই অনেকের মনে জাগরিত হতে পারে।

যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ব্রাহ্মধর্মের একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন সহসা তাঁর হিন্দু সন্ন্যাসীতে রূপান্তর, কেশবের লোকান্তর, প্রতাপ, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এবং কেশব বিজয়, প্রতাপাদির অনুরক্তবৃন্দ যখন রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত

হচ্ছিলেন তখন ব্রাহ্ম আচার্য (বিজয়কৃষ্ণের আচার্য পদ ত্যাগের পর) শিবনাথ শাস্ত্রী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অশোভন কথা প্রয়োগ করেন। অনুমিত হয়—দল রাখতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ন্যায় ব্যক্তির মুখ থেকে তখন রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিছক মিথ্যা প্রচারগুলি বের হচ্ছিল, এও ব্রাহ্মধর্মের পতনের অন্যতম কারণ। শিবনাথ, নরেন প্রভৃতি তরুণ ব্রাহ্মদের বলতেন— রামকৃষ্ণের সমাধি স্নায়বিক দুর্বলতা-বশতঃ একপ্রকার মৃগীরোগ। তিনি যে বাহ্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাও মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই লক্ষণ। এইরূপ কুৎসা প্রচারের ফলে কি হল? নরেন প্রভৃতি তরুণের দল ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে রামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে গেলেন। অথচ এই শিবনাথই তাঁর শেষ জীবনে 'Men I have seen' গ্রন্থমধ্যে রামকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শিবনাথ ঐ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বলেন, "অনন্যসাধারণ বৈরাগ্য, কঠোরতা ও নিষ্ঠার দ্বারা তিনি (রামকৃষ্ণ) এমন এক পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন যা কমই দেখা যায়। তিনি যে একজন সিদ্ধপুরুষ এবং পরমার্থ সত্য লাভ করেছেন এ বিষয়ে আমি (শিবনাথ) নিশ্চিত হয়েছিলাম। কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধেও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতাপ মজুমদারের ন্যায় বহু কথা লিখে ঠাকুরকে দেব-মানব রূপে অঙ্কিত করেছেন। শিবনাথকে ঠাকুর যেমন খুব ভালবাসতেন, শিবনাথও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম আচার্য হয়ে দল রাখবার জন্য ঐরূপ করেছিলেন বা ঐরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে হয়। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি দ্বারা দেখা যায় ব্রাহ্ম-আচার্যগণ কর্তৃক রাজা রামমোহনের প্রবর্তিত পন্থাকে অগ্রাহ্যকরণ এবং ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে মতভেদ ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ভাঙ্গন যুগপ্রয়োজনেই হয়েছিল। এরূপ ভাবে আত্মঘাতী নীতি গ্রহণ না করলে পর সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে যে গোঁড়ামী, নোংরামি, ভণ্ডামি ও কুসংস্কারগুলি ছিল তার যবনিকা পতন কখনও সম্ভব হত না। এরই জন্য গদাধরের আবির্ভাব হয়েছিল ধরাধামে।

যত মত তত পথ ও তালে ভঙ্গ না দেওয়া

(মান+হুঁস—বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্রলাল সঙ্গে)

ঠাকুর বলেছেন—যত মত তত পথ। তার অর্থ হল, যে যেরূপ ভাবেই ভজন করুক না কেন, যে যেরূপ ভাবে ভগবানকে ডাকুক না কেন, ভগবান লাভ হবেই। অবশ্য ডাকার মত ডাকা চাই। রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের সমস্ত মত ও পথ এবং মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্মের সমস্ত সার তত্ত্বগুলি জেনে নিয়েছিলেন; ভৈরবীর কাছে সম্পূর্ণ তন্ত্র ও যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং তোতাপুরির নিকট ব্রহ্মবাদ শিক্ষা করে সর্বসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলেই—রামকৃষ্ণের বাণী সকলের অন্তর স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েছিল। রামকৃষ্ণই "যত মত তত পথ" বলবার একমাত্র অধিকারী। রামকৃষ্ণের পূর্বে পৃথিবীর কোন মনীষী বা সাধুসজ্জন এরূপ সরল ভাবে বলতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ, অবশ্য ভারতীয় মুনি ঋষিদের সম্মুখে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্মের জটিলতা প্রকটরূপে দেখা দেয় নাই, আর যদিও বা প্রকটতা বিদ্যমান ছিল বা থাকত, রামকৃষ্ণের ন্যায় এরূপ ভাবে সর্বধর্ম পরীক্ষা করতে কেউ অগ্রণী হন নাই বা অগ্রসর হতে কেউ সাহসীও হন নাই। রামকৃষ্ণ যে পথের সন্ধান জগৎসভায় ব্যক্ত করেছেন, তিনি সেই পথে বিচরণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন বলেই বা তিনি সব পথে হেঁটে চূড়ান্তকে স্পর্শ করে ফিরে এসেছেন বলেই দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন, "যতমত তত পথ"।

বৃন্দাবন যাবার অনেক উপায় ও পথ আছে—তথায় হেঁটে যাওয়া যায়, যাওয়া যায় পালকিতে, ঘোড়ায় অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে, গরুর গাড়ীতে অথবা সাইকেলে, ট্রেনে, মোটরে বা

বিমানে ; যে কোনভাবেই যাওয়া যাক না কেন, বৃন্দাবন পৌঁছান যাবেই। পৌঁছান যাবেই একথা অতি সত্য, তবে কেউ দুঘণ্টায় পৌঁছবে, কেউ দুদিনে, কেউ দুমাসে ; দ্রুত হোক, দেরীতে হোক একদিন তথায় সকলে মিলিত হবেই। তাই রামকৃষ্ণের কথা “যত মত তত পথ”। এই সহজ পথে পৌঁছাবার দ্রুত বাহন হচ্ছে “মা” মন্ত্র জপ করা এবং মা মা বলে কাতর ভাবে ডাকা। এই সাধনার মধ্যে কোন আড়ম্বর নেই, নেই কোন উগ্র তপস্যার প্রয়োজন।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—যিনি একজন খ্যাত বৈজ্ঞানিক, যাঁকে ঠাকুর বলেছিলেন—ইনি খুব ভাল ডাক্তার আর এঁর খুব বিদ্যা। সেই মহেন্দ্রলাল বলেন—আমি ঠাকুরের চিকিৎসা করতে আসিনি, আমি নিজেই চিকিৎসিত হতে এসেছি। আমার অহঙ্কার বাড়াবেন কি—আমার অহঙ্কার ধূলো করে দিয়েছেন ; জড়বাদী ছিলুম কিন্তু জড় যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ ছাড়া কিছুই নয়—তাই দেখতে শিখলুম ; বিজ্ঞানী ছিলুম অথচ দেখলুম জানার বাইরে অজানা বিশাল এবং মহৎ অজানাকে স্বীকার করে প্রণাম করলুম। মহেন্দ্রলালের রসা-স্বাদ পূর্ণ হয়ে উঠলো, চিরপুরাতনের মধ্যে পেলেন নিত্যনূতনকে। বিজ্ঞানবিদ্ স্পর্দ্ধিত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সম্পূর্ণভাবে ঠাকুরের শরণাগত হলেন। রামকৃষ্ণ এরূপ আরও দুইজনকে পরাভূত করেছেন তাঁর অমূল্য উপদেশ ও সহজ এবং সরল পথের সন্ধান দিয়ে। নরেন্দ্র নাথ দত্ত—যাঁর ছিল প্রতি বিষয়ে সংশয় ও অবিশ্বাস, তৃতীয় জন গিরিশ ঘোষ, বাগবাজারের গিরিশ, যিনি ছিলেন অকাজ কুকাজের রাজা, যিনি ছিলেন জলন্ত পাপের প্রতিমূর্তি, সেই গিরিশ ঠাকুরকে শেষ পর্যন্ত বকল্‌মা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই রামকৃষ্ণ বলেছেন প্রতীক্ষা করে থাক বিশ্বাস হারিও না ! তিনিই কি কম প্রতীক্ষা করে ছিলেন ! ‘ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়রে’ বলে কি কম কেঁদেছেন, তাই না দলে দলে বাঙলার খ্যাত অখ্যাত, জ্ঞানী বিদ্বান, রামকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত

হয়েছিলেন। বিশ্বাস না হারালে, এমন রোগ নেই যে নিরাময় হতে পারে না, এমন বাধা নেই যা অপসৃত হতে পারে না, এমন কাঠিন্য নেই যা বিগলিত হতে পারে না; সমস্ত নিয়ম নির্দেশের বাইরে ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বর অপ্রমেয়, তিনি সর্বভূতের বাসস্থান, তাই তিনি "বাসুদেব", বৃহৎ বলে তিনি "বিষ্ণু" আর "মা" শব্দের অর্থ হল বুদ্ধি।

অনেকের জীবনেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে বা ঘটে থাকে। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম করেও যখন ফল পাওয়া যায় না তখন অনেকে কার্য থেকে বিরত হয়েন, কেউ বা নূতন পথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন, কেউ হয়ত বা দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে কিছু হল না বলে মনমরা হয়ে যান বা ঘৃণ্য কাজ করবার জন্য অগ্রসর হয়ে থাকেন। তাই সহজ উপদেশ, প্রতীক্ষা করে না থাকলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। গাছের ফল, বাগানের ফসল বা পুকুরের মাছ কি সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়? প্রতীক্ষা করতে হবে ও হাঙ্গাম হুজ্জুত করতে হবেই। বীজ বুনতে বুনতেই কি ফল হয়? ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে, বীজ বাঁচিয়ে রাখতে হবে, বেড়া দিতে হবে, জলসেচ করতে হবে, পোকা মাকড় পাখীর হাত থেকে বীজ বাঁচাতে হবে। তাই ঠাকুর বলেছেন—হবে না, হচ্ছে না বলো না, শুধু লেগে থাক, জেগে থাক। আর যাই কর তালে ভঙ্গ দিয়ো না।

এখানে একটা চমৎকার উপমা আছে। এক কৃপণ রাজার দরবারে এক নট ও নটী এসেছে, নট বাজাবে—নটী নৃত্য করবে। রাজা এক পয়সাও দিবেন না; নট ও নটী ভাবল···রাজা না দেন রাজ্যের গণ্যমান্য ও প্রধান লোকেরা তো আছেন··তাঁদের কাছে তো মিলবে উপঢৌকন।

মস্তবড় আসরে নৃত্য সুরু হয়েছে, নট বাজাচ্ছে ও নটী নৃত্য করছে। লোকে লোকারণ্য। এক একটা নাচ শেষ করে নটী এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—উপঢৌকন আসে কিনা, কিন্তু একটা কানা-

কড়িও কেউ দিচ্ছে না। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর কেটে গেছে তবু কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। তৃতীয় প্রহর চলে যাচ্ছে, শেষ প্রহরও যায় যায়। ক্লান্ত অবসন্ন নটী নটকে বলল—বৃথা তাল বাজান হচ্ছে, ফুটো পয়সাও মিলল না এ পর্যন্ত। নট তোমার তাল বাজান নিরর্থক।"

বিমর্ষ চোখে ক্ষীণ হাসির আভা এনে নট বললে—

"বহুত গেয়ি, থোড়ী রহি, থোড়ীভি আব্ যায়,
কহে নট, এ নায়িকা! তালমে ভঙ্গ না পায়॥"

রাতের অনেকটা চলে গেছে, তবু অল্প কিছু আছে, সুতরাং তালে ভঙ্গ দেওয়া অনুচিত। "যতক্ষণ বর্ষে ততক্ষণ অর্শে।" হেরে যেও না, ছেড়ে দিও না,···নেচে যাও—আমিও বাজিয়ে যাই, এখনো প্রদীপে তেল আছে, এবং আশাও কিছু রয়েছে অন্তরে সুতরাং নেচে যাও, তালে ভঙ্গ দিও না।

নটের কথা শুনে আসরের মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। এক সাধু ঐ আসরে ছিলেন, তিনি তাঁর শেষ সম্বল কম্বলখানি দিয়ে দিলেন নটকে, যুবরাজ দিলেন সোনার তাগা আর রাজকুমারী দিলেন তাঁর গলা থেকে রত্নমাল্য। রাজা তো ভ্যাবা-চাকা খেয়ে গেলেন, সাধুকে কম্বল দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাধু বললেন, আজ একটি অপূর্ব মন্ত্র শিখলাম—'তালমে ভঙ্গ না পায়'। অনেকদিন সাধুগিরি করে কিছু না পেয়ে বৃদ্ধ বয়সে সংসারী হবার সংকল্প করার সঙ্গে সঙ্গে আজ পেলাম অমূল্য উপদেশ—তালমে ভঙ্গ না পায়। অনেক গেছে—অল্প আছে, কে জানে—হয়ত এই অল্পই অনেক। অতএব কাজ করে যাই, ধরে থাকি, লেগে থাকি, সিদ্ধিলাভ হবেই। 'স্বস্থানে নিয়ত স্থিত থাক, সাফল্য হবেই।'

ঠাকুর স্বস্থানে নিয়ত স্থিত থেকেই "শুধু লেগে থাক, পড়ে থাক, ধরে থাক, শুধু নাম করে যাও ও শুধু সহ্য করে যাও", বলতে পেরেছিলেন। সাংঘাতিক রোগযন্ত্রণাকালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের

সামনে নরেনকে গান করতে বলে সেই গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল তো স্তম্ভিত। এতবড় একটা কঠিন রোগী, অত্যন্ত দুর্বল, যন্ত্রণাজর্জর—তিনি কিনা মহানন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য সুরু করে দিয়েছেন। শরীরের দুঃখ কষ্ট আর নেই, চলে গিয়েছে নির্বাসনে, মন সুধা-স্নানে মাতোয়ারা। ডাক্তারের চোখেও ঘোর লেগে গেছে! ডাক্তার কি তাঁর চোখের সম্মুখে একজন ব্যাধি-ক্লিষ্ট রোগী দেখছেন, না আর কাউকে দেখছেন? এতবড় সাংঘাতিক রোগযন্ত্রনা ও অসহ্য কষ্ট যা ভুলিয়ে দিতে পারে সে নাজানি কি দ্রব্য!

ঠাকুর নৃত্যের তালে তালে সমাধিস্থ হলেন। নাড়ী চলছে না, হৃদযন্ত্রও অচল। কেবল ঠাকুর একাই কি সমাধিস্থ হয়েছেন? না সেখানে যে সকল ভক্ত জমায়েত হয়েছেন, ছোট নরেন, লাটু প্রভৃতি সবাই সমাধিস্থ, সবাই জড়পিণ্ডের মত স্তূপ হয়ে আছে। ডাক্তার সরকার ঠাকুরের চোখের পাতা মেলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন, চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। ডাক্তার সরকার ভাবলেন—বিজ্ঞান কি তবে পঙ্গু হয়ে গেল?

তারপরের চিত্র আরও বিচিত্র। সুস্থ সমর্থ ছেলেগুলি কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে। এতে কাঁদবারই বা কি আছে, হাসবারই বা কি আছে, ছেলেগুলি সহসা পাগল হয়ে গেল নাকি? যদি পাগল না হবে তবে এ আবার কিরূপ ব্যবহার। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠাকুর। তারপরেই বললেন, তুমি এমনি যা জানবে তা শুকনো, কিন্তু যখনই ঈশ্বরকে জানবে তখনই তুমি সরল ও তরল। ঈশ্বরকে জানাই চরম জানা, সমস্ত বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ঈশ্বর ও তাঁকে জানা।

ঠাকুর আর একদিন ডাঃ মহেন্দ্রলালের সম্মুখে নরেনকে গান গাইতে বললেন। শুনে ডাক্তার ইশারা করে মাষ্টারকে বললেন, গানটান আর নয়, উত্তেজিত হবেন আর তাতে মহা অনর্থ হবে, অতএব বারণ করে দাও।

ঠাকুর বললেন, গান শুনবে ?

ডাক্তার বললেন, তাঁর শুনতে বারণ নেই কিন্তু ঠাকুরের বারণ।

ঠাকুর বললেন, আমি শুনব না ?

ডাক্তার বললেন, গান শোনা তোমার অপকার, গান শুনলেই তুমি তিড়িং মিড়িং করে ওঠো।

ঠাকুর বিষণ্ণ ভাবে বললেন, কি করতে হবে ?

ডাক্তার বললেন, ভাব চেপে রাখতে হবে।

ঠাকুর বললেন, তাই রাখব, চুপ করে থাকব, তবু গান হোক।

নরেন গান ধরল, 'একি সুন্দর শোভা কি মধুর হেরি হে !' গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়ে গেল। ডাক্তার কোথায় বিরক্ত হবেন—না তিনি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই আশ্চর্য মুখের দিকে ! একি মানুষের মুখ! একি জ্বর-জরা-পীড়িত মর্তদেহ না সূর্যাগ্নিসঙ্কাশ দিব্য পুরুষ ? গান শুনতে শুনতে বিজ্ঞানসেবী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারেরও চোখে জল। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, তুমি রসবে ! ঠাকুরের কথা, না ফলে যায় কি ? বিজ্ঞানবিদ্ মহেন্দ্রলাল সরকারের কোলের মধ্যে ভাবাবেশে ঠাকুর পা তুলে দিলেন। বললেন—ডাক্তার, তুমি খুব শুদ্ধ, খুব খাঁটি, তা না হলে কি তোমার গায়ে পা রাখতে পারি ? ঠাকুরের তখন দুই চোখেই জল। ঠাকুর বললেন, ভক্তিমান কে ? যে শক্তিমান, সেই আসলে ভক্তিমান, শক্তি হচ্ছে সহ্য করার শক্তি, আঁকড়ে থাকার শক্তি।

মাষ্টারকে বললেন ঠাকুর, সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয় তা নয়, কারু কারু চট্ করে হয়ে যায়। আমার কিন্তু বেশী কষ্ট পেতে হয়েছিল, মাটির-ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতুম, আর মা ! মা বলে ডাকতুম ও কাঁদতুম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। এই তো একমাত্র ডাক—সাড়া না আনলেও সান্ত্বনা আনে, আর যখনই সান্ত্বনা পেলে তখনই বুঝলে সাড়া এসেছে। রামকৃষ্ণ পুনঃ বলছেন—

আর কেউ আমার থাক কি না থাক, আমার 'মা' আছেন, এই তো ধরে থাকবার কৌশল। মা ছেলেকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান, কিন্তু মা যখন বুঝবেন ছেলে খেলনা চায় না 'মাকেই' চায়, তখন আর মা কি করবেন। তাই মাকেই শুধু ধরে থাক। তারপর বললেন, ঈশ্বর দর্শনের জন্যই নরজন্ম, তাই সমস্ত বদ্ধ কুঠুরির চাবি-কাঠি হচ্ছে 'মা ডাক'। মাতৃস্তোত্র পাঠ করে বল—মা, তুমি প্রসন্ন হও; মা প্রসন্না হলেই কামকাঞ্চনের লাজ-লজ্জা খসে পড়বে; উদ্ভাসিত হবে তোমার অভয় অক্ষয় মাতৃমূর্তি; তাই তুমি সমস্তরূপিণী বিদ্যামূর্তি। যা কিছু দেখি সব তোমারই ভেদ; মাতৃরূপে তোমারই বিশ্বকে তুমি পরিপূর্ণ করে রেখেছ, সমাচ্ছন্ন করেছ। তুমি সর্বস্বরূপা, সর্বশক্তিসমন্বিতা, তুমি আমাদের ভয় থেকে ত্রাণ কর, ত্রাণ কর জন্মমৃত্যুপীড়িত অল্পাজ্ঞতা থেকে। মহেন্দ্রলাল সরকার স্তম্ভিত হলেন, তিনি ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। কোথায় বিজ্ঞান ও তার শক্তি, কোথায় বা তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির দাপট। বিজ্ঞান বল, জ্ঞান বল, বিদ্যা বল আর যাই কিছু বলনা কেন ভগবৎ শক্তির নিকট সকল সহজ হয়ে যায়।

এমন যে কেশব সেন যাঁর বক্তৃতাপ্রভাবের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাশে সমান আসনে বসে আলাপ করবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলেন, যার ভারতের চতুর্দিকে হাজার হাজার ব্রাহ্ম চেলা, সেই ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন দক্ষিণেশ্বর এসে ঠাকুরের সাথে কথাবার্তার সময় তাঁর বিদ্যা, বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা লুপ্ত হোয়ে যেত, তিনি কেবল ঠাকুরের মুখনিঃসৃত বাণী মন দিয়ে শুনতেন এবং তার ভাবার্থ গ্রহণ করবার চেষ্টা করতেন। কেশব দেখলেন রামকৃষ্ণের কাছে উপাধি, বিদ্যা, পৈতা ও জাতির কোন ভেদ নাই; যে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে সেই আশ্রয় পায়, তা সে হিন্দু হোক, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম যাই হোক না কেন। বট বৃক্ষের নীচে যেমন হাজার হাজার বিভিন্ন প্রকারের লোক আশ্রয়

নিচ্ছে, সেইরূপ রামকৃষ্ণের কৃপার ছায়াতলে বিভিন্ন প্রকারের লোক আশ্রয় গ্রহণ করছেন, ঠাকুরও বিশ্ব-কারিকরের ন্যায় তাঁদের গড়ে ঠিক করে দিচ্ছেন। কেশবও ঠাকুরের পরশমণির ছোঁয়ায় নূতন ভাবে নূতন রূপে গড়ে উঠে নবজীবন লাভ করেছেন। মহান কেশব কলিকাতা মহানগরীর সমস্ত গুণী জ্ঞানীদের চালক হয়েছিলেন অর্থবলে নয়—বিদ্যা ও জ্ঞানের বলে, সেই কেশব যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শরণ গ্রহণ করলেন বা সুলভ সমাচার, সানডে মিরর এবং থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউতে ঠাকুরের লীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন দেশের গুণী জ্ঞানী, ডাক্তার, উকিল, মাষ্টার, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়র, হাকিম, ব্যবসাদার, খ্যাত ও অখ্যাত ব্রাহ্মভক্ত, জমিদার, নির্ধন, ছাত্র ও ছাত্রের জনকজননী দলে দলে দক্ষিণেশ্বর এসে ঠাকুরের মুখে কথামৃত শুনতে জমায়েত হতে লাগলেন। এদিকে রামকৃষ্ণও ডাকছেন—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী, আয় তোরা, যাদের ধীরতার মধ্যে আছে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মধ্যে বীর্য তারা চলে আয়, বনজঙ্গল ভেদ করে, নদী নালা সাঁতরে চলে আয় বায়ুবেগে।

ব্রাহ্মধর্মের প্রধানরাও এসে উপস্থিত হচ্ছেন ঠাকুরের নিকট তত্ত্বকথা শুনবার জন্য। বালকভাব আয়ত্ব করবার জন্য রামকৃষ্ণ বালকের সাথে মিশতে বলতেন। তিনি বলেন, বালক ভাব না হলে মায়ের কৃপা হয় না। ঠাকুর নিজে প্রায় সময়ই বালকের ন্যায় আখখুটেপনা করতেন, পা ছড়িয়ে কাঁদতেন এবং বালকের মতই পরণের কাপড়খানা খুলে রেখে দিতেন—এবং কখনও বালকের ন্যায় দিগম্বর হয়ে থাক্‌তেন। ঠাকুরের আচরণও যেমন বালকের ন্যায়, স্বভাবটিও সেইরূপ বালকের মত। হীরানন্দ এসেছেন, মস্ত ভক্ত, তাঁর সাথে এসেছেন দুইজন ব্রাহ্মভক্ত। ঠাকুর তো প্রায় দিগম্বর অবস্থায় আছেন, তাই এক আধবার কাপড়খানি টানছেন কোমরের কাছে—আর হীরানন্দকে বলছেন, কাপড় খুলে গেলে কি তোমরা অসভ্য বল? হীরানন্দ

বললেন, আপনার তাতে কি? আপনি তো বালক! ব্রাহ্ম প্রিয়-নাথকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুর বলছেন, ইনি কিছু বলছেন? তারপরই শিশুর মত বলে উঠলেন, মাইরি কোন শালা ভারায়! মাইরি আমি সভ্য হয়েছি। বলতে বলতেই তিনি আবার বলে উঠলেন—কত মনে করি সভ্য হব, কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না শরীরে, আমাকে বালকের মত করে রাখেন। তিনি বালকের ভাবটা কিরূপ একটা উপমা দিয়ে বললেন, সেবার একটা ছোট ছেলে ফুল নেবে বলে বায়না ধরলে, বাপ বোঝাল নিতে নাই, ওফুলে ঠাকুরের পূজা হবে। কে শোনে কার কথা, ছেলে কান্না জুড়ে দিল, আমি তখন তাকে দিলুম ফুল। ফুল পেয়ে কি আনন্দ সেই শিশুর, তারপর? তারপর 'দূর যা' বলে সে ফুল সে ফেলে দিল ছুঁড়ে। তাই ঠাকুরের কথা—বালকের ন্যায় হবে, বালকদের সাথে মিশবে, শিখবে শিশুরা মাকে কি ভাবে ডাকে, শিখবে শিশুদের মত আখখুটেপনা।

প্রিয়নাথ বলল, পায়ে বন্ধন এগুতে দেয় না। ঠাকুর বললেন, থাক না পায়ে বন্ধন, মন নিয়ে কথা, মনে কেন বাঁধন পরাও? মন যে আমার বশ নয়—প্রিয়নাথ বলল। তখন ঠাকুর বললেন, মন অভ্যাসের বশ, মনকে যেদিকে খুশি নিয়ে যেতে পারবে।

শ্রীমাও তাঁর এক ভক্ত সন্তানকে অভ্যাসের ফলের কথা বলে, তাকে বললেন—দেখলে অভ্যাসের কত শক্তি, জপ করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধঃ জপাৎ সিদ্ধঃ জপাৎ সিদ্ধঃ (জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ)। অবশ্যই এই কথার পূর্বে শ্রীমার এক ভক্ত সন্তান অভ্যাসবলে এক সাহেব কেমন করে একটি প্রকাণ্ড ষাঁড়কে কোলে নিয়ে বেড়াতে পারতেন তার কথা বলে-ছিলেন। মা বলছেন, ধ্যান জপে মনের ময়লা কাটে, মনের ময়লা না কাটলে কৃপার প্রসাদ ধরবে কি করে? ফুল নাড়তে নাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়। তেমনি ভগবানের (জপ)

আলোচনা করতে করতে ভগবানের উদয় হয় চোখের সামনে। কৃপাই বড় কথা, একমাত্র কৃপাতেই হবে। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবার জো নাই।

পুনরায় ঠাকুর বলছেন, মানুষের কতটুকু শক্তি, সে শক্তি দিয়ে কতটুকু সে চেষ্টা করবে, কতটুকুই বা সে আয়ত্ত করবে ?

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, জ্ঞান-ভক্তি দুই একসঙ্গে হতে পারে নাকি ?

ঠাকুর বললেন, আধারের উপর নির্ভর করে, আধারই বড় কথা, এক সের ঘটিতে কি দুই সের দুধ ধরে ?

মাষ্টার বললেন, যদি তাঁর কৃপা হয় বা তিনি যদি কৃপা করেন তবে তো সূঁচের মধ্য দিয়ে উট‌ও চালাতে পারেন।

ঠাকুর হেসে বললেন, কৃপা কি অমনি হয় ? ভিখিরি যদি পয়সা চায়—দেওয়া যায়, কিন্তু যদি একেবারে রেলভাড়া চেয়ে বসে ? এরপরই ঠাকুর স্তব্ধ হলেন, মাষ্টারও চুপ করে গেলেন। ঠাকুর আত্মগতের মত বললেন, হাঁ হতে পারে। তাঁর কৃপা হলে, কারু কারুর আধারে দুই হতে পারে। কেন পারবে না ? তাঁর কৃপায় কি দড়ির বেড়া আছে ? এর দৃষ্টান্ত নরেন, এমন কি ডাক্তার সরকারও বুঝি দলে ভিড়ল।

ডাঃ সরকার এসে বলছেন, কাল রাত তিনটার সময় তোমার জন্যে বড্ড ভেবেছিলাম, ডাক্তারের গলা স্নেহসিক্ত।

ঠাকুর বললেন, কেন বলত ?

—বৃষ্টি হচ্ছিল তখন। ভয় হল তোমার ঘরের দোরটোর খুলে রেখেছে না কি করেছে, কে জানে ? বললেন ডাঃ সরকার।

বিহ্বল হয়ে ঠাকুর বলছেন, বল কি গো !

—তোমাকে যে-ভালবেসে ফেলেছি, তোমাকে ছুঁয়ে ধরে আমারও প্রায় সাধু হবার দশা ; এখন তোমার দেহটি টিকিয়ে রাখতে না পারলে কি করে দুদিন সঙ্গ করি ? বলছেন ডাঃ সরকার।

—সর্বক্ষণই দেখছি যে, দেহ আলাদ, আত্মা আলাদা। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা তেমনি। যেমন খাপ আলাদা, তলোয়ার আলাদা। তাই তো দেহের অসুখের জন্য বলতে পারি না মাকে।

ডাক্তার বললেন, দেহটি থাকলেই তো নাম গুঞ্জন হবে।

তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ কচ্ছি,—বলছেন ঠাকুর ভক্তদের, নইলে সর্বদাই যদি বল—এত কষ্ট, তবে দেহ যাক, তাহলে দেহ যায়।

ঠাকুরের কষ্টের অবসানের জন্যে, দেহের অবসান হোক এও তো ভাবা যায় না। ডাক্তার সরকারকে না জানিয়ে—পি, মজুমদার একডোজ নাক্সভমিকা দেওয়ায় ডাঃ সরকার খুব চটে গিয়ে বলছেন, আমি তো মরিনি!

ঠাকুর পরিহাস করে বললেন, তোমার অবিদ্যা মরুক! প্রথমটা যদিও ডাঃ সরকার বুঝতে পারেন নাই, তারপর অবশ্য কথাটা ভালরূপেই বুঝেছিলেন। অবিদ্যা 'গণিকা' নয়, অবিদ্যা সন্ন্যাসীর অবিদ্যা 'মা', সন্ন্যাসী হবার পূর্বে অবিদ্যা 'মা' মারা যায়। আর বিবেক সন্তান হয়। ডাক্তার সরকারেরও বিবেক সন্তান হয়েছে। ঠাকুর যখন অপর এক ভক্তকে বললন, মদেই তুমি মাতাল, শুঁড়ির দোকানের মদের হিসাবে তোমার কি দরকার?

ডাঃ সরকার বললেন, আর ঈশ্বরের মদ অনন্ত, সে মদের শেষ নাই। তিনি সমস্ত হিসাবের পার।

দর্পী কেশবকে ঠাকুর যেমন স্বমতে আনতে পেরেছিলেন সেইরূপ স্পর্দ্ধিত বিজ্ঞানবিদ্ মহেন্দ্রলাল সরকারও ঠাকুরের অনুগত হলেন। ডাঃ সরকারই একদিন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, ভক্তিতে কিছু হবে না জ্ঞান চাই, সমাধিকে বলেছিলেন 'ঢং'। এই বিজ্ঞানাচার্য মহেন্দ্রলাল ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল বিজ্ঞানের মধ্যে ও চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে সমাধিকে খুঁজে পেলেন না, আবার এই সমাধিকে নিছক পাগলামী বলে উড়িয়ে দিতেও পারলেন না,

কারণ একই সঙ্গে এতগুলি লোকের কি ভাবে সমাধি সম্ভব হতে পারে এটাও ভাববার বিষয়। এই মহেন্দ্রলালই বিদ্যার গরবে কেশবের ন্যায় জগৎ সংসারকে তৃণের ন্যায় মনে করতেন, তারপর ঠাকুরের কাছ থেকে যখন জানলেন—"প্রকৃত জ্ঞান জন্মে অহংকার নিধন হলে পর," তখনই তিনি হলেন সরল ও নিরহংকার। ঠাট্টা করে যখন মহেন্দ্রলাল গিরিশকে ধরলেন, ওঁকে (ঠাকুরকে) ঈশ্বরের পূজা দেওয়া ভাল নয়', তার উত্তরে ভৈরবরূপী গিরিশ বললেন' যাঁর কৃপায় ভীম সন্দেহ সাগর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছি তাঁর চরণরেণু কেন—তাঁর বিষ্ঠাকে বিষ্ঠা বলে জ্ঞান করি নি!

গিরিশ, নরেন, লাটু, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতির গুরুভক্তি ও নির্ভরতা দেখে বিজ্ঞানবিদের চোখেও ধাঁধাঁ লেগে গেল, তাঁর চোখেও ভক্তির অশ্রুবন্যা দেখা গেল। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলালও ভক্তি নম্র হৃদয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন, এমন কি ভক্ত গিরিশের চরণ ধূলিও ডাক্তার ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন।

রামকৃষ্ণের পরশমণির ছোঁয়ায় মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় দর্পিও কেশবের ন্যায় মান+হুশে রূপান্তরিত হলেন তাই ঠাকুর বললেন, বেদান্তমতে স্ব স্ব রূপকে চিনতে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠিস্বরূপ—যেন জলকে দুভাগ কচ্ছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা।

সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।

রামকৃষ্ণ-দর্শন

(সত্যসাধনা)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, সাধনা আর কি? সহজ সাধন—সদা সত্য কথা বলবে। সত্য কথা বলা, এতো তোমার নিজের আয়ত্তের মধ্যে, এর জন্য প্রয়োজন নাই দৌড়-ঝাঁপের, উগ্র তপস্যার, এর জন্য প্রয়োজন হবে না শাস্ত্র পড়বার, প্রয়োজন হবে না যাগ যজ্ঞ ও তীর্থ পর্যটনের। সহজ ভাবে সংসারে চলো, ফেরো আর সত্য কথাটি আঁট ক'রে ধ'রে রাখো। কি হয়েছে, কি দেখেছ, কি করেছ ঠিক ঠিক বলো। যারা বিষয়-কর্ম করে, অফিসের কাজ করে, কি ব্যবসা করে, তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত। কথার আচরণে সত্যকে ধীরে ধীরে আরোপ ক'রতে পারলে, দেখা যাবে কত বড় প্রচণ্ড শক্তির আধার হ'য়েছ তুমি!

পাহাড় পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সত্যময় জীবন পাহাড়কে প্রশস্ত রাজপথে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখে। এই সত্য-রক্ষার জন্যই তিনি মাকে সমস্ত অর্পণ করেছিলেন কিন্তু সত্য অর্পণ করতে পারেন নাই। ঠাকুরের উপদেশ—তুমি মহাসত্যের সাধক হও।

যদি তুমি সত্যসাধক হ'তে পার, তাহলে অনন্তশক্তি ও অনন্ত-জ্যোতিঃর সন্ধান তোমার করায়ত্ব হবে। কিন্তু সত্যসাধনার মধ্যে যদি বিচারবুদ্ধি এসে যায়, তা হ'লে তোমার সর্বপ্রচেষ্টা কালিমা-লিপ্ত হ'য়ে যাবে। সত্যসাধনার মধ্যে বিচারবুদ্ধি না থাকলে তুমি জড়ের মধ্যে, অণু-পরমাণু ও জীব-জগতের মধ্যে সত্যস্বরূপিণী মাকে দর্শন করতে পারবে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল, বৃক্ষলতাদির মধ্যে সর্বব্যাপিণী স্নেহঘন-মাতৃমূর্তি দর্শন ক'রতে সমর্থ

হ'বে। সাধক বহির্দর্শনে যখন মাতৃদর্শনলাভ ক'রতে পারে বা দর্শনলাভের যোগ্য হন, তখন তাঁর অন্তরদর্শনও লাভ হ'য়ে থাকে। তাই সাধক সত্যকে মাতৃ-সাধনার শ্রেষ্ঠ সোপান মনে করে। সত্য প্রতিষ্ঠা কর, সত্যসাধনায় আত্ম নিবেদন কর। স্মরণ রাখতে হ'বে সত্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে তুমি যতই সাধনভজন কর, যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন কর বা শত সহস্র সাধু মহাত্মার উপদেশ গ্রহণ কর, তোমার অন্তরে প্রকৃত শান্তি আস্‌তে পারে না।—তুমি ভগবানের নাম মুখে যতই উচ্চারণ কর না কেন, যতই আসন প্রাণায়াম ও যোগ-সাধনা অভ্যাস কর না কেন, সত্য-স্বরূপ অমৃতের আস্বাদন যতক্ষণ তোমার না হ'বে, ততক্ষণ মুখে ভগবানের নাম উচ্চারণ ও জপ সবই মিথ্যা। ভগবানকে লাভ ক'রতে হ'লে বা তাঁর কৃপালাভ ক'রতে হলে সত্য প্রতিষ্ঠা, সত্য চৈতন্যের উপলব্ধি এবং সত্য চৈতন্যের অনন্ত রূপ হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন ক'রতে হবে, নচেৎ ইহা সম্ভব নয়। সাধক সত্যনিষ্ঠ হ'লে পরই তাঁর নামে রুচি আসে। নামই সার, নামের মহিমায় পাপ, তাপ দূরে চ'লে যায়—নামই সার; নাম ছাড়া জীবের কোন গতি নাই। হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্। নাম কর, নাম কর সার—নামের মহিমা অপার।

রামকৃষ্ণ বলেন, একটি সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস। সে রামাইৎ, তার সাথে অন্য কিছু নেই—কেবল একটি লোটা ও একখানি বই। বইখানি তাঁর বড় আদরের, ফুল দিয়ে নিত্য পূজা ক'রত ও এক একবার খুলে দেখত। তার সাথে আলাপ হবার পর একদিন অনেক ক'রে ব'লে ক'য়ে বইখানা দেখতে চেয়ে নিলুম। খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালিতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে ওঁ-রাম। সে বললে—মেলা গ্রন্থ পড়লে কি হবে? এক ভগবান থেকেই তো বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে, আর তাঁর নাম আর তিনি তো অভেদ। অতএব চারবেদ, আঠার পুরাণ আর সব শাস্ত্রে যা আছে তাঁর একটি নামেতে তা রয়েছে, তাই তাঁর

নাম নিয়েই আছি। সাধুর নামে এমনই বিশ্বাস ছিল। এই কথারও ধ্বনি আমরা পাই ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি বশিষ্টের মধ্যে।

মহারাজ দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে ভ্রমক্রমে হত্যা ক'রে যখন অন্ধমুনি ও তদীয় অন্ধ পত্নীর নিকট মৃতপুত্রকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন তখন একমাত্র পুত্রের শোকে উভয়ে দেহরক্ষা করলেন। মর্ম-পীড়িত দশরথ গুরু বশিষ্টের আশ্রমে এলেন স্ত্রীহত্যা ও ব্রাহ্মণ-হত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিধিও বিধান লাভের জন্য। গুরু বশিষ্ঠ আশ্রমে উপস্থিত না থাকায়, গুরুপুত্র বামদেবকে ঘটনাবলী ব্যক্ত করায়, তিনি ব্যবস্থা করলেন—তিনবার রামনাম জপ ক'রলেই এই মহাপাতক দূরে চলে যাবে। গুরু বশিষ্ঠ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করামাত্রই বাম-দেব দশরথের আগমন ও ব্যবস্থা বর্ণনা করলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ পুত্রের এবংপ্রকার ব্যবস্থার কথা শ্রবণে বজ্রগম্ভীর নিনাদে বলে উঠলেন, আরে অযোগ্য পুত্র, তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও। মাত্র একবার রামনাম উচ্চারণে যেথায় শত সহস্র পাপ খণ্ডিত হয়ে যায়, সেখানে তিনটি ব্রাহ্মণহত্যার জন্য তুমি তিনবার রামনাম জপের ব্যবস্থা করেছ? তোমার ভগবানে মোটেই বিশ্বাস নেই, যদি থাকতো তবে এরূপ অর্বাচীনের মত ব্যবস্থা কখনও করতে পারতে না। তুমি নামমাহাত্ম্য না জেনে নামের অবমাননা করেছ। একবার মাত্র রামনামে মহানরক অনন্তস্বর্গে পরিণত হওয়া যেথায় সম্ভব, সেথায় তুমি তিন বার রামনাম উচ্চারণের ব্যবস্থা করে মহা অন্যায় কার্য করেছ। মহাপ্রভু এই নাম সম্বন্ধে বলেন,—

এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

যেখানে নামের এমন শক্তি ও মহিমা, আজ সেই নামের কথা আমরা ভুলে গেছি। শ্রীচৈতন্য, ভক্ত রামপ্রসাদ ও পরমহংস রামকৃষ্ণ এই দেশে নামের শক্তি দেখিয়ে গিয়েছেন। মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ীরূপে দর্শন করে নামের মহিমা কীর্তন করে গেছেন, আর আমরা আজ

ঘাটায় অঘাটায় মায়ের পূজা করি ঘটা করে। সেই পূজার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন, সত্যদর্শন ও আত্মদর্শন আছে কি? ঘটাই মুখ্যস্থান অধিকার করে, বিশ্বাস, অর্চনা প্রভৃতি হয়ে দাঁড়ায় গৌণ। তাই ঠাকুর বলেন, বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নেই। তাঁর কাছে আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও বলে প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল, সরল বিশ্বাস, বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসের কত জোর। রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল কিন্তু হনুমানের রামনামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে। শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসই সব। শ্রদ্ধা বিশ্বাস দ্বারা স্বর্গ, মোক্ষ, জ্ঞান প্রভৃতি অতি সহজেই লাভ করা যায়।

ঠাকুর বলেন, হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না, সর্বদাই সংশয়। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না। ভগবান অর্জুনকে বললেন—একমনে অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে যে ডাকতে পারে, তাকে অদেয় আমার কিছু নেই, আমি তার জন্য সব বহন করে থাকি। অর্থাৎ যে ভক্ত তৎগত হয়ে কায়মনোবাক্যে তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে পারে, তারই মনে এই ধারণা হবে—হে ভগবান, তুমি আমার স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী জননীরূপিণী, তুমি আমার সর্ব কর্মের সারথি, আমাকে মহামঙ্গলময় স্থানে নিয়ে যাবার একমাত্র অধিকর্তা তুমি, আমার পাপপঙ্কিল দেহের ধুলো রাশি মুছিয়ে দিয়ে পবিত্র ক'রতে পার একমাত্র তুমি। তুমি আমার গতি; একমাত্র সহায় ও উদ্ধারকারিণী। তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমি কাঁদালে আমি কাঁদি, তুমি হাসালে আমি হাসি, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। এরূপভাবে মায়ের উপর আত্মসমর্পণ ক'রতে পারলেই "নামশক্তি"র হ'বে বিকাশ ও প্রকাশ।

আজ দিকে দিকে ভজন কীর্তন হয়, কিন্তু নামমাহাত্ম্য কোথায়? নামের শক্তিতে আমাদের হৃদয় স্পন্দিত ও ধ্বনিত

হচ্ছে না কেন? সত্য প্রতিষ্ঠা বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার অভাবের জন্যই তো।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, সত্য কথা কলির তপস্যা।

সত্য কথা, অধীনতা অর্থাৎ ঈশ্বরের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—অধীন আমি ঈশ্বরেরই হ'তে পারি। তদ্‌গত হ'য়ে তাঁরই চরণতলে আমার কামনা বাসনা সমস্তই অর্পণ করতে পারি। এ ছাড়া কার অধীন আমি হ'ব? তাই ঠাকুর অধীনতার কথা বলেছেন ও পরস্ত্রী মাতৃসমান—এই তিনটি ভাব সাধকের হৃদয়ে দেখা দিলে সে অসাধ্য সাধন ক'রতে পারে। সাধক কায়মনোবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন ক'রলে সত্যসংকল্প হয়। এর পরই ঠাকুর বললেন, রামের বাড়ী গেলুম, লুচি খাব না ব'লে ফেলেছি। যখন খেতে দিলে তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে। কি করি, লুচি খাব না বলেছি, তাই মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। তার পরে চাই ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণ বলেন, যদি ঈশ্বরের জন্য কারোর প্রাণ ব্যাকুল হ'য়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বোঝা যায় যে, এর ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। ব্যাকুল হ'য়ে মার কাছে আবদার কর। ব্যাকুল হ'লে তিনি শুনবেনই শুনবেন। দাও পরিচয়—নয় গলায় ছুরি দিব। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি সব সুযোগ ক'রে দিবেন। বৃন্দাবন লীলার ভেতর তোরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই কেবল দেখ্ না—ধর্ না—ঈশ্বরের প্রতি মনের ঐরূপ টান না হ'লে তাঁকে পাওয়া যায় না। কামগন্ধহীন না হ'লে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। ছাখ দেখি, গোপীরা স্বামী, পুত্র, কুল, শীল, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয় সব ছেড়ে, শ্রীকৃষ্ণের জন্য কতদূর উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। ঐরূপ ক'রতে পারলে, তবে ভগবান লাভ হয়। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটী-কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হ'য়ে দেহবুদ্ধির লোপ

হ'ত। তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ'তে পারে রে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণও অনুরূপভাবে কাঁদতেন আর বলতেন—যা, দিন তো গেল, কই, এখনও তোমার দেখা পেলুম না। আবার কখনও বলতেন—ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি তো জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন, আমি কিছুই জানি না। দয়া ক'রে দেখা দিতে হ'বে। তাই ঠাকুর বলেন—রোজ রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করলে ব্যাকুলতা আসে। একদিনে হয় না। রাতদিন কেবল কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকলে ব্যাকুলতা কেমন ক'রে আসবে? মা মা বলে আবেগকম্পিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ডাকলে পর, সে ডাক নিশ্চয়ই মায়ের কানে পৌঁছাবে! শিশুর মত ব্যাকুল হ'য়ে মা! মা! বলে ডাকলে ও কাঁদলে মায়ের কৃপা লাভ হ'বেই। কৃপা ও সত্যসাধনাই হ'ল বড় কথা। তাঁর পাদপদ্মে শরণ মিলে সমস্ত পাপ ও মলিনতা দূর হ'য়ে যায়। নিজেকে যখনই শুদ্ধবুদ্ধ ব'লে চিনতে পারবে, তখনই সত্যের ও নামের মহিমা ভালরূপে বুঝতে পারবে। তার পর চাই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন না থাকার জন্য যত গোলমালের সৃষ্টি। আমরা অমৃতের সন্তান হ'য়েও নিজেদের ক্ষুদ্র মনে করি এবং নিজেদের পাপী ভাবি।

রামকৃষ্ণ বললেন, তোমরা অত পাপ-পাপ কর কেন? বার বার আমি পাপী, আমি পাপী ব'ললে, তাই হ'য়ে যায়; এমন বিশ্বাস চাই যে তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? তিনি আমার বাবা মা, তাঁকে বলো, যে পাপ করেছি আর কখনও করব না। তাঁর নাম কর, জিহ্বা পবিত্র হ'য়ে যাবে। দেহমন পবিত্র হ'য়ে যাবে। পাপ পাখী উড়ে পালাবে দেহবৃক্ষ থেকে। ঈশ্বর তোমার বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো, বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? এমন বন্ধুকে যদি না চেন তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব।

পবিত্র ভারতভূমির সন্তান আমরা—আমরা যে অমৃতের সন্তান।

সুতরাং আমরা অসত্য, কপটতা, প্রবঞ্চনাকে প্রশ্রয় কেন দেব? এবং কেন আমরা উচ্ছিষ্ট-ভোজীদের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে দিন কাটাব? যে নাম একবার উচ্চারণ ক'রলে পর সব দুঃখ, জ্বালা, পাপতাপ ও অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায় সে নাম কেন আমরা করি না, কেন আমরা শরণাগত হচ্ছি না? শরণাগত হ'লে পরম সাধকের কোন চিন্তার কারণ থাকবে না। তখনই সে আত্মদর্শন লাভ ক'রতে পারবে—তখনই বুঝতে পারবে আমরা অমৃতের সন্তান।

এখানেও রামকৃষ্ণ আত্মদর্শন সম্বন্ধে একটি মনোরম চিত্রের অবতারণা করে ব'ললেন—একটা বাঘিনী ছাগলের পালকে আক্রমণ করেছিল। একটা ব্যাধ দূর থেকে ওকে মেরে ফেল্লে। ওর পেটে ছানা ছিল, সেটা প্রসব হয়ে গেল। সেই বাঘিনীর ছানাটা ছাগলের সঙ্গে বড় হ'তে লাগল। প্রথমে শাবকটি ছাগলমায়েদের দুধ খায়, তারপর একটু বড় হ'লে ঘাস খেতে আরম্ভ করলে ছাগলের মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে। একদিন একটা ভয়ঙ্কর বাঘ ছাগলদের পাল আক্রমণ করলে। সে অবাক হয়ে দেখলে যে, ওদের ভেতর একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছে, আর ছাগলের সঙ্গে 'দৌড়ে দৌড়ে' পালাচ্ছে। তখন ছাগলদের কিছু না বলে ঐ ঘাসখেকো বাঘটাকে ধরলে। সেটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল। তখন তাকে একটা জলের ধারে টেনে নিয়ে গেল। আর বললে—এই জলের ভেতর তোর মুখ দেখ্। দেখ্, আমার যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি। তারপর তার মুখে একটু মাংস গুঁজে দিলে। প্রথমে সে কোন মতে খেতে চায় না—তারপর একটু আস্বাদ পেয়ে খেতে লাগলো। তখন বাঘটি বললে, তুই ছাগলের সঙ্গে ছিলি, আর ওদের মত ঘাস খাচ্ছিলি। ধিক্ তোকে। তখন সে লজ্জিত হ'ল। আমরাও ঘাসখেকো বাঘের মত হ'য়ে পড়েছি, আমরা ভুলে গেছি আমরাও মানুষ—আমাদেরও মান সম্বন্ধে হুশ আছে; আমরাও চেষ্টা করলে অসাধ্য

সাধন করতে পারি। দীর্ঘকাল আমরা অহল্যার ন্যায় পাষাণ হ'য়ে পড়ে থাকব কি? রামকৃষ্ণ বলেন, ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর কাছে ব'সে যে যা চাইবে তাই পাবে। এই কলিযুগে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন নেই। আন্তরিকভাবে একদিন ব্যাকুলভাবে নির্জনে কেঁদে ডাক—তাহলে তিনি দেখা দেবেনই। তবে স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এইবোধ—ততক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে এইবোধ—ততক্ষণ জ্ঞান। যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহঙ্কাব থাকতে মুক্তি নেই। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতকপাখীর বাসা নীচে, কিন্তু উঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তাতে জল জমে তবে চাষ হয়, তেমনি তাঁর কৃপাবারি যেখানে—অহংকার সেখানে মেজ না।

জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকারই সব আবরণ করে রেখেছে। **আমি** মলে ঘুচ্‌বে জঞ্জাল। মেঘ সূর্য্যকে ঢেকে রেখেছে। মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। মায়া বা অহং যেন মেঘ—অহং বুদ্ধি গেলেই ঈশ্বর দর্শন হয়। অহংকার করা বৃথা। ধন মান যৌবন কিছুই চিরকাল থাকে না, অতএব অহং থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আবার ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন করলে অহং নিজের বশে আসে, সুতরাং জ্ঞানী দেখে—অন্তরে ও বাইরে সেই পরমাত্মা।

ব্রহ্মজ্ঞান ও সমদর্শন

(পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্গে)

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

যাঁর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে, তাঁর কাছে বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে, গো, হস্তী ও কুক্কুরাদি-জীবে সমদর্শন থাকে। এখন দেখতে হবে সমদর্শন কি এবং কাকে বলেছেন শ্রীভগবান। সমদর্শী সাধক মহাজ্ঞানী, তিনি একই আত্মাকে সর্বত্র ও সর্বজীবে অধিষ্ঠিত দেখতে পান বলে তিনি কুকুরের উপর উপবিষ্ট হ'য়ে নিজেও খান এবং কুকুরকেও খাওয়াতে পারেন। এই সমদর্শী ভক্তের নিকট বিষ্ঠা, চন্দন, গঙ্গাজল, নর্দমার জল, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল এবং অমৃতে ও বিষে কোন ভেদ নেই। তাঁর সর্ব বিষয়ে সমজ্ঞান।

এই সমদর্শী পুরুষ তাঁর চোখের সম্মুখে বিষ্ণুময় জগৎ দেখতে পান, সুতরাং তিনি কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব-জগৎ, অণুপরমাণু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা থেকে পাহাড়-পর্বতের মধ্যেও শিব দর্শন করেন। আত্মদর্শন না হলে সমদর্শন লাভ হয় না। সমদর্শী মহামানব জগজ্জননী মাকে সর্বভূতে ও সর্বজীবের মধ্যে দেখতে পাবেন। এরূপ দর্শন সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে, মুখে বলা ও লেখায় ব্যক্ত করা যত সহজ এরূপ দর্শন লাভ কি প্রকৃত প্রস্তাবে সহজ? না, এ বড় কঠোর তপস্যা। জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করা বা জীবের মধ্যে আত্মদর্শন দেব-মানব ভিন্ন সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব। যে সাধক সর্বজীবকে আপনার প্রাণের ধন বলে মনে করেন, যে ভক্ত সর্বজীবের মধ্যে আত্মার বিকাশ ও প্রকাশ দেখতে পান, যাঁর দৃষ্টিতে কোনরূপ বৈষম্য নেই, যাঁর কাছে ছোট বড়, দোষত্রুটী ও পাপ পাপীর বিচার নেই, যাঁর বাক্যে কেবল অমৃত নিঃসৃত হয় এবং যাঁর

দৃষ্টির সম্মুখে অমৃত লোকের দৃশ্য জাগরিত হয়, যিনি অন্তরে বাইরে, আকাশে বাতাসে অধঃ উর্দ্ধে মাকে দেখতে পান, তিনিই সমদর্শী। এখন কথা হচ্ছে সমটা কি? 'স' সৃষ্টিবাচক এবং 'ম' হচ্ছে লয়-বাচক বাক্য। এই সৃষ্টি এবং লয় যাঁর ভেতর একত্রে গ্রথিত আছে, তিনিই কেবল সম উপলব্ধি করতে পারেন। সৃষ্টি ও লয় উভয়ে বিপরীত ধর্মী কিন্তু যে ভক্তের অন্তরে সৃষ্টি ও লয়ের দুইটি বিপরীত ভাব লীন হ'য়ে যায়, তিনিই সমভাবের অধিকারী অর্থাৎ তিনিই সমদর্শী। যিনি জীবনে-মরণে, দোষে-গুণে, আলোতে-আঁধারে জ্ঞানে অজ্ঞানে, নিত্যে অনিত্যে সমজ্ঞান করেন তিনিই প্রকৃত সমদর্শী। এই সমদর্শন আমরা পূর্ণ মাত্রায় দেখতে পেয়েছি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিটি নির্দেশ বাক্য মেনে চলতেন এবং তিনি পৃথিবীর সর্বধর্মশাস্ত্রের মর্মবাণী নিজে উপলব্ধি করে সরল ভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কথামৃত শাস্ত্রবাক্য-সম্মত। উপরে বর্ণিত গীতার শ্লোকটি তিনি এমন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দেবেন মজুমদারের মধ্যে (তিনি) কোন পার্থক্য দেখেন নাই। বিনোদিনী প্রমুখ অবিদ্যা মেয়েদের মধ্যেও মা ব্রহ্মময়ীকে প্রত্যক্ষ দেখতেন, কেবল তাই নয় সর্বস্তরের স্ত্রীজাতিকে তিনি মাতৃজ্ঞান করতেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তুমি সমদর্শী হবে। আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে ও অপরাপর ভক্তদের বললেন, কৃষ্ণই জগৎ সংসার, একথা হৃদয়ে ধারণা করে সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ করবে), সর্বজীবে দয়া বলেই ঠাকুর সমাধিস্থ হ'লেন, কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলতে লাগলেন, জীবে দয়া, জীবে দয়া, দূর শালা! কীটাণুকীট তুই, জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না! জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা পূজা।

জীবকে সেবারূপ পূজা করা এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবৎ

দর্শনই হল প্রকৃত পূজা। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সমজ্ঞান পূরো মাত্রায় ছিল বলে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এবং রস্‌কে মেথরকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। যাত্রার দলের ছোকরাদের সাথে যেমন অবলীলা-ক্রমে ঈশ্বরীয় কথা বলতেন তদ্রূপ তিনি সাবলীলভাবে ঈশ্বরীয় আলোচনা করেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, মহাপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমদর্শন পূর্ণ মাত্রায় ছিল বলেই তিনি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে দরিদ্র নরনারায়ণের পাতের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান ছিল বলেই তিনি নিজের কেশরাশিদ্বারা পায়খানা পরিষ্কার করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ অণু-পরমাণু ও জীবজগতের মধ্যে মা ব্রহ্মময়ীর সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই ফুল বিল্বপত্র দিয়ে মায়ের পূজা করা ছেড়ে দিয়ে সমাধির আনন্দেই মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমদর্শন ছিল বলেই তিনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন—যার জন্য জগজ্জননী মাকে সর্বরূপে, সর্বভাবে এবং সর্বত্র দেখতে পেতেন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মায়ের লীলাভূমি মনে করে নিত্য আনন্দরসে ডুবে থাকতেন। তিনি আত্মদর্শন করেছিলেন বলেই মৃন্ময়ী মাকে চিন্ময়ী করে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতেন, তাঁর উপদেশ মত সাধনমার্গে বিচরণ করতেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের ব্রহ্মদর্শন ও আত্মদর্শন হ'য়েছিল বলেই তিনি ছিলেন ভগবান বর্ণিত প্রকৃত সমদর্শী। দেশে পণ্ডিতের অভাব নাই, শাস্ত্রপাঠও করেন বহু লোকে। অথচ তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে উঠে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ করলে কি হবে, তাদের মন সর্বদা কামকাঞ্চনে আসক্ত থাকবার দরুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। গ্রন্থ নয়! গ্রন্থি-গাঁট। রামকৃষ্ণের সরল উপদেশের ভেতরেই পাওয়া যায়—কেবল ধর্ম গ্রন্থ-গাদা পড়লেই হবে

না, সাধনা চাই, আর চাই ভগবানের কৃপা। তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না বা হতে পারে না অথবা হবার নয়। গীতার অপর আর একটি শ্লোকে দেখা যায়—

"স্থির বুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ—"

স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মেই অবস্থান করে তবে মূঢ় ব্রহ্মবিদ্ হলে চলবে না, শাস্ত্রানুশীলন করে বা তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্বের ঈষৎ আভাস লাভ করলেই চলবে না, সাধকের হৃদয়-মন্দিরটি ব্রহ্মবেদময় হওয়া চাই, বুদ্ধি বিবেচনা ব্রহ্মে স্থির হওয়া চাই, জীবভাবীয় মূঢ়তা বিসর্জন দিয়ে পরমাত্মায় আত্মনিয়োগ করা চাই, নতুবা ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্ম প্রভৃতির বুলি ফাঁকা হয়ে দাঁড়াবে। যে ভক্তের হৃদয় ব্রহ্মভাবে মুগ্ধ থাকে, তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় জ্ঞান থাকে না, তাঁর আনন্দ ও বিহারের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ দেখা দেয় না। যে ভক্ত **মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন** করেছেন তিনি জগতের ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখে বিচলিত না হয়ে মায়ের লীলা দর্শন করে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তিনি কোন আঘাতে বিকম্পিত হ'ন না, অমৃত ও গরলকে অমৃত রূপেই পান করেন। এই সাধকের ধ্যান মা, তিনি দর্শন করেন মা, তিনি শ্রবণ করেন মাতৃবাক্য, সুতরাং তিনি সত্যিকারের ব্রহ্মবিদ্। তাই ঠাকুর বলেন, বিবেক বৈরাগ্যের সাথে বই না পড়লে পুস্তক পাঠে দাম্ভিকতা ও অহংকারের গাঁট বেড়ে যায় মাত্র।

উদ্ধবের কথা উল্লেখ করে ঠাকুর বলছেন, উদ্ধব গোপীদের বলছেন—তোমরা যাকে তোমাদের কৃষ্ণ বলেছ, তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই জীব জগৎ হয়ে আছেন। তারপরই বলছেন, নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে যে, নিত্য কৃষ্ণ, তার নিত্য ভক্ত। চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম। এর পর বললেন, আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম; এগার মাস বেদান্ত শোনালে, কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই মা মা! যখন গান করতুম—ন্যাংটা কাঁদতো। বলতো 'আরে কেয়া রে?' দেখ, অতবড়

জ্ঞানী কেঁদে ফেলত। এরপর ছোট নরেনকে বলছেন, এটা জেনে রেখ—আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়; ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল দেখা দেবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঠিক ঠিক ভাব ছিল এবং তিনি মাতৃ দর্শন করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন, তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায় তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন। এইজন্যই ঠাকুর দৃঢ়ভাবে তাঁর উপদেশের মাধ্যমে বলতেন,সাধন চাই,শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে, অনেক পড়া আছে কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই, ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোটাও জল পড়ে না। বিদ্যাসাগরের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে মাষ্টারকে ঠাকুর বলছেন আর দু-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখা প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে বসে রং ফলায়। প্রতিমা প্রথমে এক-মেটে, তারপর দো-মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং, পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। এতগুলি সৎকাজ করছে কিন্তু অন্তরে কি আছে জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা করে। মাষ্টারের সাথে এরূপ কথাবার্তার ১৯ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট শনিবার বৈকাল ৪টার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাষ্টার, ভবনাথ, ও হাজরাকে সঙ্গে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা করতে আসেন। এই বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামের পুরুষসিংহ। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে প্রতি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান লাভ করে পরে সেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছিলেন কিন্তু তেজস্বী পুরুষ সেই ঈশ্বরচন্দ্র আত্মসম্মান কোনদিন বিসর্জন দেন নাই। তাই কর্তৃপক্ষের সাথে মনের অমিল হওয়ায় এক কথায় অত বড় সম্মানজনক চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ছাত্রসমাজের মঙ্গলের জন্য বিবিধ প্রকারের পুস্তক রচনা করেন ও স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা অদ্যাবধি সেই স্কুল-কলেজগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের মহানুভবতার সাক্ষ্য প্রদান করে। ঈশ্বরচন্দ্র মাতা ভগবতীর আজ্ঞা পালন করবার জন্য উত্তাল তরঙ্গায়িত দামোদর সাঁতরে পার হতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দানবীর ও দয়ার সাগর। কত দরিদ্র অনাথার তিনি অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন, কত ছাত্রকে তিনি অকাতরে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতেন, এমন কি কবি মধুসূদন যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন প্রচুর অর্থসাহায্য করে তাঁকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার জন্য তিনি নিজে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। এরূপ ভাবে এক ঝাঁকা-মুটের কলেরার সময় বিদ্যাসাগর সেই হতভাগ্যকে নিজ গৃহে এনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেই দানবীর দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গৃহে এসে পৌঁছলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। উপরে এসে তিনি সমাধি ভঙ্গের পর জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর, মাষ্টারের সাথে পরামর্শ করে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেন। মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরকে বললেন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি ; এইবার সাগর দেখছি। সহাস্যে বিদ্যাসাগর বললেন, তবে লোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ তদুত্তরে বললেন, না গো ! লোনা-জল কেন ? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। ঠাকুরের কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন। ঠাকুর তারপরই বলছেন, তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

এর পরই ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেছেন ঠাকুর—তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের-রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে সাত্ত্বিক কর্ম বটে কিন্তু রজোগুণ, সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুক-দেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছ, এত ভাল। নিষ্কাম কর্ম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, কেউ পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, কেমন করে? রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, আলু পটল সিদ্ধ হ'লে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া! বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়। এই শুনে ঠাকুর বললেন, তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া, না এদিক, না ওদিক। শকুনি উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত কিন্তু আসলে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া-ভক্তি বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য। এর পরই ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যার পার, তিনি মায়াতীত। তিনি বলছেন, এ জগতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে অসৎও আছে, ভাল আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, ভালমন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর তাতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে। ঠাকুর ব্রহ্মের কথা বলে বলছেন, ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বলা যায় না; সব জিনিসই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হোয়েছে কিন্তু একটি জিনিস কেবল

উচ্ছিষ্ট হয় নাই—সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি তা আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর এই কথা শুনে বললেন, বা! এটি তো বেশ কথা, আজ একটি নূতন কথা শিখলাম। এরপর ঠাকুর কয়েকটি উপমা দিয়ে ব্রহ্মের কথা বুঝিয়ে বলবার পর বললেন, তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? সাগরের যেমন হিল্লোল কল্লোল। ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে তিনি আনন্দস্বরূপ-সচ্চিদানন্দ। শুক দেবাদি এই ব্রহ্মসাগরতটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়; মানুষ চুপ করে যায়। ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। একজন প্রশ্ন করলেন—সমাধিস্থ হলে (যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে) তিনি কি আর কথা কন না? ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন—শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হলে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি, পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্‌কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে। আবার কথা কয়। ঠাকুর পুনঃ বলছেন, যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়! তারপর বলছেন, ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল; বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটতো। সকালবেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান-চিন্তা করতো, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁওয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা ক'রে রাখতো, তবে ব্রহ্মকে বোধ করতো। অন্যান্য কথার পর ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীর পথও পথ।

জ্ঞানভক্তির পথও পথ। আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞান যোগও সত্য, ভক্তি পথও সত্য। সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ আমি রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তি পথই সোজা। বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। এই জগৎসংসার তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তম, তিন গুণে হয়েছে। তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানী দেখে যিনি ব্রহ্ম তিনিই ভগবান। এই জীবজগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ। তারপর ঠাকুর বুঝিয়ে বলছেন, বিভু রূপে তিনি এক, কিন্তু শক্তি বিশেষ—যেমন দেখনা, এই জগৎ কি চমৎকার! কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি। এই কথায় বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি কি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?

তদুত্তরে ঠাকুর বললেন, তিনি বিভু রূপে সর্বভূতে আছেন, পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ! তা না হলে—একজন লোক দশজন লোককে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনার কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন ? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো ? তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মান কি না ? এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। এর পরেই ঠাকুর পুনঃ বললেন, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। গীতার অর্থ কি ? দশবার বললে যা হয়, "গীতা গীতা" দশবার পড়লে ত্যাগী হয়। গীতার এই শিক্ষা 'হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করার চেষ্টা কর।' সাধুই হোক সংসারীই হোক, মন থেকে আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ-ভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন একজন গীতা পড়ছে আর একজন দূরে বসে শুনছে আর কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব

জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব বুঝতে পারছো? সে বললে, ঠাকুর, শ্লোক এসব কিছুই বুঝতে পারি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বললে, আমি দেখছি অর্জুনের রথ আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্ছেন। এই দেখে আমি কাঁদছি। এর পর ঠাকুর ভক্তিযোগ রহস্য, আমি ও আমার অজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার, নিষ্কাম কর্মের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরদর্শনের কথা বলে বিদ্যাসাগকে বলছেন, অন্তরে সোনা আছে এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে--এগিয়ে যেতে হবে। আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতেছিল। ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখলে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই— এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপোর খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব নিয়ে আণ্ডিল হয়ে গেল। নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে, ঈশ্বরে ভালবাসা হয়। ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়—যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কইছি।

ত্যাগী, সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত এবং কামিনী-কাঞ্চনের কথা

শ্রীরামকৃষ্ণ যে কেবল মাতৃ-আরাধনাই করতেন বা তিনি ভগবৎ চিন্তায়ই সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন অথবা কেবল ঈশ্বরীয় কথার ব্যাখ্যাই করতেন, তা নয়। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মান যাতে উন্নত হতে পারে, তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন। জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়ে সমাজের জঞ্জাল-গুলির যাতে মূলোচ্ছেদ হতে পারে, তার জন্যও ছিল তাঁর আকুলতা, ব্যাকুলতা। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে মানুষ হতে পারে, যাতে তাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে পারে, এর জন্য তিনি অমূল্য উপদেশ প্রদান করতেন। কোন দিকটাই তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারতো না। তাই তিনি বলতেন, কর্ম কর চুটিয়ে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলো না। এর পরই বলতেন, অভ্যাস কর, আয়ত্ত হবে, এক দিনেই কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না—অভ্যাস কর, অভ্যাস দ্বারাই সমস্ত কাজ সহজ ও সরল হয়ে যায়। তার পরেই বললেন, অভ্যাস না হলে কিছু হয় না বা হবার নয়। সাধুসজ্জন বল, জ্ঞানী গুণবান আর সাধারণ গৃহস্থই বল, অভ্যাস না হলে কিছু হয় না বা হবার নয়। এর পরই একটি সুন্দর উপমা দিলেন: ছুতোরের মেয়ে একদিকে চিঁড়ে কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু তার লক্ষ্য রয়েছে মুষলের দিকে। সংসারের সর্ব কর্ম করে যাও, কিন্তু তোমার লক্ষ্য থাকবে ভগবানের দিকে। তাই শ্রীঠাকুর বলছেন, "অভ্যাসের থেকেই অনুরাগ। কাঁদতে কাঁদতে শোক, খেতে খেতেই খিদে বাড়ে, চলতে চলতে পথ পাওয়া যায় এবং প্রদীপ জ্বালতে জ্বালতে নিজে প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠা,

এগোতে এগোতে মণি মুক্তোর সন্ধান পাওয়া। এ খুব কঠিন অভ্যাস সন্দেহ নাই। কঠিন বলে যদি নিবৃত্ত না হও, তবেই তো কৃপা হবে। তার পরই বলছেন, যারা সংসারের মধ্যে থেকেও মাকে ডাকতে পারে তারাই প্রকৃত বীর সন্তান। এর পরই তিনি বলছেন, কাজ তো করবেই, তবে শরণাগত হতে হবে। শরণাগতি মানে কারোর কাছে হাত জোড় করে চুপচাপ বসে থাকা নয়। শরণাগতি মানে হচ্ছে শরণে আগতি অর্থাৎ এগিয়ে গিয়ে ধরা, জোর করে ধরা, আঁকড়িয়ে ধরা বা আঁক্‌ড়িয়ে ধরে থাকা।

এর পরই বললেন, যে সয়, সে রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। কী অমূল্য উপদেশ! যে সয় সে রয়। তুমি সহ্য করে থাক, বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে রয়ে যাও তুমি, তোমার জয় হবেই। আমাদের দেশেও একটা চলতি কথা আছে 'লেগে থাক্‌লে মেগে খেতে হয় না।' কাজ কর, কাজে লেগে থাক। রোক করে কাজ কর, কাজে সফলতা আসবেই। রোক যেমন থাকা চাই, তেমন থাকা চাই যা একবার মিথ্যে বলে জেনেছ, তাকে রোক করে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা। না যদি পার তাহলে কিসের মনুষ্যত্ব? শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বুঝতে পারলেন, রাসমণির মন্দিরে কালীপূজায় কোন দোষ নেই, ভক্তের কোন জাত নেই, তখনই তিনি রোক করে সকল উপাধি পরিত্যাগ করে মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময় বলতেন, রোক চাই, রোক না হলে কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না বা হতে পারে না। নরেন্দ্রনাথের রোক ছিল বলেই তিনি বিবেকানন্দ হয়ে অল্পদিনের মধ্যে দেশময় আলোড়ন করে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। তার পরই তিনি বললেন, যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে, সেই বীর ভক্ত। সংসারত্যাগী ঈশ্বরকে ডাকবে, তার মধ্যে বাহাদুরী কি আছে! যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকবে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখে গহ্বরে কি আছে? সেই বাহাদুর ও বীর পুরুষ।"

এর পরই বললেন, "শুধু লেগে থাক, পড়ে থাক, ধরে থাক, শুধু সহ্য করে যাও ও ভগবানের নাম কর, তোমার জয় সুনিশ্চিত।" এ অমূল্য উপদেশ কেবল সাধন, ভজন, পূজা-অর্চনা, আসন-প্রাণায়ামের ক্ষেত্রে নয়। সর্বক্ষেত্রেই এ উপদেশ ফলবতী হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর পরই তিনি বলছেন, যখন যেমন, তখন তেমন, যাকে যেমন, তাকে তেমন। তুমি যেখানে থাকবে, সেই স্থানের নিয়ম কানুন মেনে তোমাকে থাকতে হবে। সেখানে যদি দুর্বিনীত লোক থাকে, মাতাল থাকে, তাদের উপদেশ দিতে যেও না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—তুমি উপদেশ দেবার কে? আর কেনই বা তোমার উপদেশ তারা শুনবে? উপদেশ দিতে হলে রীতিমত 'চাপ-রাশ' পাওয়া চাই, চাপ রাশ না থাকলে উপদেশ দিতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। মাতালকে মাতাল বললে সে তোমায় খিস্তি করবে, কামড়ে দিতেও পারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ—মাতালকে উপদেশ ও ধর্মকথা না বলে তাকে খুড়ো জ্যাঠা বলে ডাকলে সে তোমায় আদর করতে পারে। গায়ে পড়ে কাউকে উপদেশ দিতে গেলে কাজের চাইতে অকাজই বেশী হয়।

তার পরই তিনি বলছেন, দেখবি শুনবি, বলবি না। অন্যায়ের প্রতিবাদের চাইতে সহ্য করা ভাল, সহ্যের গুণ আছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না যাওয়াই ভাল, তুমি কে যে প্রতিবাদ করবে? তুমি কি দণ্ডমুণ্ডের মালিক? এর পরই তিনি নিত্য নৈমিত্তিক জীবনযাত্রা সম্পন্ন করতে হলে কি করণীয়, তাই বলে উপদেশ দিচ্ছেন যা সাধারণতঃ গৃহীদেরও মনে উদয় হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, হাঁড়ি কিনবে বাজিয়ে, যেন ফুটা-ফাটা না হয়। হাঁড়িওয়ালা যেন মনে করতে না পারে যে হাঁড়ি সম্বন্ধে তুমি অনভিজ্ঞ। বাজারে যদি ফাউ জোটে, তাও নিয়ে নেবে, ঠকে না যাও সেদিকে লক্ষ্য রাখবে বৈকি? তারপর বললেন, ঠিক ঠিক জিনিস দিল কি না মিলিয়ে দেখে তবে দাম দিবে, সব জিনিস দেখে শুনে কিনবে, জিনিস কিনবে

বাজিয়ে। এর পরই বললেন, সরল হবি, উদার হবি, বিশ্বাসী হবি। তা বলে বোকা বাঁদর হবি না, হবি না কাছাখোলা, আলা-ভোলা, নেলা-খেপা। কী চমৎকার উপদেশ যা আমাদের ধারণার বাইরে। এই উপদেশ সংসারী ও সাধু সন্ন্যাসী সকলের জন্যই মূল্যবান্। সরল হও, উদার হও, বিশ্বাসী হও, তা বলে বোকা হয়ো না। লোকে যেন তোমায় বোকা ঠাওরাতে না পারে, সে-দিকে নজর রাখতে হবে। তারপরই ঠাকুরের উপদেশ—তোমার হক্ ছাড়বে না, ছাড়বে না তোমার স্বত্ব।

এর পরই তিনি বললেন, মনুষ্যত্ব, লোকশিক্ষা ও অধ্যাত্ম বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হলে ভাগবতের অবধূতের মত পৃথিবী, বৃক্ষ, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, কপোত, অজগর, সমুদ্র, পতঙ্গ, মধুকর, হাতি, হরিণ, মৎস্য ও চিল প্রভৃতিকে তোমার উপগুরু বা শিক্ষাগুরু করে নিতে হবে। এদের কাছ থেকে তুমি শিক্ষা পেয়ে জ্ঞান আহরণ করে প্রকৃত মানুষ হয়ে জীবন যাপন করতে পারবে। এর পরই ঠাকুর বলছেন, অবধূত দেখতে পেয়েছেন, পৃথিবীর কাছ থেকে শিখতে হয় আপন ব্রতে অচল থাকা, শিখবে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা। বৃক্ষের কাছে শিখবে পরার্থে জীবন ধারণ। গাছকে কেটে ফেললেও কিছু বলে না, যত্ন না করলেও ছায়াদান ও ফলদানে কার্পণ্য করে না। বায়ু অনাসক্ত, গন্ধ বহন করে তত্রাচ লিপ্ত হয় না। আকাশ অনন্ত, তবু সে সামান্য ঘটের মধ্যে ঢুকে যায়, ব্যাপ্ত হয়ে আছে মেঘ-লোকে অথচ মেঘ তাকে ছুঁতে পাচ্ছে না। আত্মা যেমন ব্যাপ্ত হয়ে থেকেও অসংশ্লিষ্ট হয়ে আছেন অস্পৃষ্ট। সংসারে থেকে সব কাজ করে যাবে, কিন্তু থাকবে পাঁকাল মাছের মত পরিচ্ছন্ন, থাকবে আকাশের মত অসঙ্গ। এর পরই জলের কথায় বললেন, জল স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ ও মধুর। জল যেমন সকলকে নির্মল করে, তুমিও তোমার দর্শন, স্পর্শন ও কীর্তন দ্বারা ত্রিভুবনকে পবিত্র কর। আগুনের উৎপত্তি ও বিনাশ শিখার, আগুনের নয়। তুমি আগুনের ন্যায় তেজে

ও তপস্যায় দীপ্ত হও, যারই সেবা পাও না কেন পাপমনে লিপ্ত হয়ো না। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি নাই—আছে চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি। সেই রূপ জন্ম মৃত্যু শরীরের—আত্মার নয়। তারপর বললেন, সূর্যের কছে থেকে কি শিক্ষণীয় আছে? সূর্য পৃথিবী থেকে একটু একটু জল গ্রহণ করে সেই জল পৃথিবীকে প্রচুর পরিমাণে অর্পণ করেন। তেমনি সংসারী মানুষ তুমিও বিষয় গ্রহণ করে যথাকালে আর্তদের বিতরণ কর। ঠাকুর তাই মথুরকে দিয়ে কাশীধাম যাবার পথে এবং মথুর-বাবুর জমিদারী দেখ্‌তে গিয়ে দরিদ্র নিরন্নদের অন্ন, বস্ত্র ও তৈল দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তুমি বিষয় গ্রহণ কর, বিষয় রক্ষণা-বেক্ষণ কর, বিষয় রক্ষার সময় বৈষয়িক লোকের ন্যায় বিধি ব্যবস্থা কর। কেউ যেন বুঝতে না পারে তুমি বোকা। কিন্তু তোমার লক্ষ্য ও আকুতি থাকবে অর্থ আর্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য। এরপর কপোতের কথায় বললেন কপোতের কাছ থেকে শিখবে আসক্তি বর্জন ও অতি স্নেহে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হওয়া। অজগরের নিকট শিক্ষণীয় বিষয় হল—অজগর দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে পড়ে থাকে, যা জোটে তাতেই সন্তুষ্ট। ঐরূপ অনাসক্ত হবে ও ধৈর্য ধারণ শিক্ষা করবে। সমুদ্রের কাছ থেকে শিখতে হবে নিত্য সরসতা ও পরিপূর্ণতা। কারণ সমুদ্র কখনও শুষ্ক হয় না আবার অতি বর্ষায় স্ফীতও হয় না। পতঙ্গের নিকট কি শিক্ষণীয় থাকতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন কামমূঢ় হয়ো না। আগুনে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গ পুড়ে মরে, সেইরূপ বস্ত্রাভরণসজ্জিতা নারী দেখে উড়ে পড়ো না—পুড়ে মরবে। দৃঢ়ব্রত হতে বলেছেন ঠাকুর। মধুকরের নিকট কি শিক্ষণীয় আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, মধুমক্ষিকা জানা অজানা সকল ফুল থেকেই মধু সংগ্রহ করে জমা করে রেখে দেয়। তোমরাও মানী অমানীর কাছ থেকে সার সংগ্রহ করবে। আর শিখবে সঞ্চয়নিবৃত্তি। মধুমক্ষিকা না খেয়ে না দেয়ে কৃপণের ন্যায় মধু সংগ্রহ করে কিন্তু অন্যে এসে কেড়ে নেয় তার সঞ্চিত ধন 'মধু'। সেইজন্য তিনি বললেন, কৃপণের

ধন সেয়ানের পেটে যায়। হাতির কথায় বললেন, হাতি গর্তে পড়ে হস্তিনীর মোহের জন্য। সুতরাং সন্ন্যাসী দারুময় যুবতী মূর্তিকেও স্পর্শ করবে না। তাহলে হাতির ন্যায় গর্তে পড়ে ধরা পড়তে হবে। হরিণ বড় চালাক, দলবেঁধে চলে। একটু শব্দ শুনলেই ছুটে পালায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কিন্তু তাকে ধরা পড়তে হয় ব্যাধের গীতে আকৃষ্ট হয়ে। তার পরই বললেন, ঋষিশৃঙ্গমুনিও নারীদের নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আটকা পড়েছিলেন সংসারে। তাই নৃত্যগীতের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে না। মাছের কথায় বললেন, রসনা জয় করতে পারলেই সর্ব জয় হবে ; রসে জিতে জিতং সর্বম্। বঁড়শির টোপে আমিষ দিয়ে মাছ ধরা হয়, লোভে পড়লেই মাছ টোপ গেলে ; সুতরাং রসনাকে সংযত করতে না পারলে মানব-জীবন অসার। এর পর চিলের কথা বলে একটি রসাল উপদেশ দিলেন। চিল চেষ্টা-চরিত্র করে মাছ ধরে ঠোঁটে করে নিয়ে যাচ্ছে, অন্য সব চিল তাকে তাড়া করল, ঠোকরাতে লাগল। তখন অনন্যোপায় হয়ে সেই মাছটা ফেলে দিল মুখ থেকে—ব্যস, নিস্তার হল তখন। আর তাকে পায় কে ? দ্রব্যে অনাসক্তি তখন। তাই তিনি বলছেন, দ্রব্য থাকলেও দ্রব্যে অনাসক্তি থাকা চাই। এই অমূল্য উপদেশগুলি কেবল উনবিংশ শতকের লোকদের জন্যই নয়, এ প্রত্যেক শতকের জন্যই মূল্যবান ও অপূর্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা, তত্রাচ সংসারী লোকের টাকার প্রয়োজন আছে, তা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বহুবার বলেছেন, সৎ উপায়ে তুমি অর্থ উপার্জন কর কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্মরণ রাখতে হবে অর্থ কিছুই নয়, একমাত্র ভগবানই সত্য। "তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মদন্তরতরং যদয়মাত্মা।" ভগবানের মত ভালবাসার দ্রব্য আর কিছুই নেই। ভগবানই সত্য আর সব অনিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রত্যহই বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা।

বলতেন, কামিনী কাঞ্চন-ত্যাগ করতে না পারলে ঈশ্বরের দেখা মেলে না। কিন্তু অনেককেই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথার কদর্থ করে থাকেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা মানে কাম কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা। গৃহীদের এরূপ বলেছেন, ২।১টি সন্তান হলে পর স্ত্রীকে জায়া রূপে নয়, ভগিনী রূপে জ্ঞান কর। বঙ্কিমকে বলেছেন, সংসারী লোকের যেমন টাকার প্রয়োজন আছে তেমনি আবার অর্থ-সঞ্চয়েরও দরকার আছে। কারণ স্ত্রী, পুত্র আছে—খাওয়াতে হবে তো? তবে দাসীর মত থেকে পরের ঘরে কাজ করার মত সংসারে থাকবে। তাহ'লেই অনাসক্তি হ'বে। গৃহীরা ত্যাগ করবে মনে। সন্ন্যাসী ত্যাগ করবে ভেতরে ও বাইরে উভয়তঃ। সন্ন্যাসীর কামিনী কাঞ্চন গ্রহণ করা কেমন জান, যেমন থুথু ফেলে সেই থুথু চেটে খাওয়া। এই উপদেশের কদর্থ করে অনেকে অনেকরূপ বর্ণনা দিয়ে থাকেন। সেই বর্ণনাটা অন্ধের দুধ দেখার ন্যায়। দুধ কেমন?—অন্ধ জিজ্ঞাসা করল। উত্তর হ'ল—দুধ বকের মত। বক কেমন? কাস্তের মত। কাস্তে কেমন? তখন কাস্তেখানা দেওয়া হল অন্ধের হাতে। হাতড়িয়ে বলল, তবে দুধ আল্ আল্। সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনাগুলি না বুঝে, উপর উপর মন্তব্য যাঁরা করেন, তাঁরাই বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জন্যই কামিনী কাঞ্চন বর্জন ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও একরূপ ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন না। কারণ তিনি বলতেন, যার যেমন সয়, যার পেটে যা সয়। সকলে কি পোলাও কালিয়া হজম করতে পারে? যার যেমন সয়, মা তেমন ব্যবস্থা করেন। কারোর জন্য ঝাল, কারোর জন্য ঝোল, কারোর অম্বল, আর যার কিছু সয় না, তার জন্য মাছের ঝোল ভাতের ব্যবস্থা করে থাকেন, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণও যার যেমন, তার জন্য তেমন ব্যবস্থা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারীদের কামিনী সম্বন্ধে সংযত হতে বলেছেন, তার পরই বলেছেন, কাঞ্চন সম্বন্ধে প্রয়োজন তোমার অনাসক্তি। এর পরই বলেছেন, তোমার কামিনী কাঞ্চন

ত্যাগ নয়, পরিহার নয়, নিষেধ নয়, আরোপও নয়, তবে কি ? একটু বেঁকিয়ে দেওয়া—কামের থেকে প্রেম চলে যাবে, আত্ম থেকে আত্মায়, সুতরাং বলা চলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা সংসারী ভক্তের জন্য নয়।

অনেকের ধারণা হীন কার্য করলে বুঝি কিছুতেই ঈশ্বরের কৃপা হয় না। কেশবকে বললেন, পাপী পাপী করলে পর পাপীই হতে হয়। গিরিশ যখন বললেন, আমি পাপী, ঘোরতর পাপী। ঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠেলেন, পাপী ? খবরদার, ও কথা মুখে আনবিনে। বারে বারে পাপী পাপী বললে পাপীই হয়ে যেতে হয়। বল, আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছেলের আবার পাপ কি ? সব ধূলো-কাদা মুছে যদি কোলে তুলে না নেবেন, তবে আবার তিনি কেমন মা ? বল, আমি দুর্বল নই, অধম নই, পাপী নই, নই আমি দীন-হীন, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি অকল্মষ, আমি বিশ্ব-প্রণেতা প্রজাপতির পুত্র। বারে বারে এই মন্ত্র জপ করলেই ভগবৎ-শক্তি শত-সর্প-গর্জনে জেগে উঠবে। দেবেন যখন বলল, জীবনে সে হীন কাজ অনেক করেছে, জঘন্য কাজ সে যে কত করেছে, তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। কাজলের ঘরে কাজ করেছে, সুতরাং সর্ব অঙ্গে তার কাজলের ছাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশান্তভাবে বললেন, সংসারে থাকতে গেলে ওরকমটি হয়। কখনও উঁচু কখনও নীচু। কখনও ঈশ্বরচিন্তা হরিনাম করে কখনও বা কামিনী-কাঞ্চনে মন দিয়ে ফেলে। কী মধুর আশ্বাসবাণী! তারপরই বললেন, যেমন মাছি সন্দেশের থালায়ও বসে, আবার পচা ঘায়ে গিয়েও বসে, সংসারের লোকের পক্ষেও ঐরূপ হওয়া স্বাভাবিক। তা ব'লে ঐটাই আদর্শ করতে হবে না। জান্‌তে হবে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, আর কাম-কাঞ্চন ত্যাগ না ক'রলে ঈশ্বর লাভ হয় না। এর পরই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যারা কষ্টের জন্য সংসার ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক। তারপরই তিনি বললেন, তিনি ঐরকম সংসার ছাড়ার দলের লোক নন। গৃহীদের

তিনি বলেছেন, তোমরা সংসার কর, ঈশ্বরকেও ডাক। সংসারীদের শুধু কাম-কাঞ্চন-ত্যাগ নয়, ঠাকুর তাদের সর্ব দিক দিয়েই সংযত থাকতে বলেছেন। আর বলেছেন, সংসারীদের উত্থান পতন তো আছেই, কিন্তু সন্ন্যাসীদের খুঁত-ত্রুটীর কোন ক্ষমা নাই। অন্তরে বাইরে উভয়তই কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ ও বর্জন কেবল তাঁদেরই জন্য, গৃহী ভক্তদের জন্য নয়। এরপরই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যেমন জালার ভেতর কোনখানে একটি ছোট ছিদ্র থাকলে ক্রমে ক্রমে সব জল বেরিয়ে যায়, তেমনি সাধকের ভেতরও একটু সংসারাসক্তি থাকলে সব সাধনা বিফলে যায়। এখানেও সেই কথার সুর পাওয়া যায়—কাম-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে সন্ন্যাসীই হোন বা গৃহী ভক্তই হোন, সাধকের সব সাধনাই মিথ্যা। তারপর তিনি বললেন, যে সাধু ঔষধ দেয়, যে সাধু ঝাড়-ফুঁক করে, যে সাধু টাকা নেয়, যে সাধু বিভূতি তিলকের খুব আড়ম্বর করে, খড়ম পায়ে দিয়ে যেন সাইন-বোর্ড মেরে নিজেকে 'সাধু' বলে অপরকে জানায়—তাদের কদাচ বিশ্বাস করবি না। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু—অর্থ, মান, যশ কিছুই চান না। সেইজন্য ভগবান তাঁদের কোন অভাব রাখেন না। এর পরই তিনি একটি অপূর্ব উপমা দিলেন—চিনিতে বালিতে মিশে থাকলে পিঁপড়ে যেমন বালি ফেলে দিয়ে চিনি খায়, তেমনি সাধু ও পরমহংসেরা এ সংসারে সদ্বস্তু যে সচ্চিদানন্দ তাকেই গ্রহণ করে, আর অসদ্বস্তু কাম-কাঞ্চন তা ত্যাগ করে। এরপরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী লোকের মধ্যে অনেক তফাত। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী ও ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসে না, মধু বই আর কিছু পান করে না, কিন্তু সংসারী অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসে, ঘায়েও বসে। তাই ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না, সন্ন্যাসী নারী হেরবে না—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। আর টাকা

কড়ি? টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা। হিসাব, দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, লোকের উপরে ক্রোধ, দেহের সুখের চেষ্টা, এই সব এসে পড়ে। সন্ন্যাসীর টাকা নেওয়া বা লোভে আসক্ত হওয়া কিরূপ জান? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবার অনেক কাল হবিষ্যি খেয়ে ব্রহ্মচর্য করে বাগ্দী-উপপতি করা। এরপর বললেন, সন্ন্যাসীর এত কঠিন নিয়ম কেন জান? সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলেই লোকের মনে ত্যাগ করতে সাহস হবে। ঠাকুরের এই মহান উপদেশের পর আমরা নির্ভাবনায় বলতে পারি—তিনি টাকা মাটি, মাটি টাকা ও কামিনী-কাঞ্চন বর্জনের কথা যা বলেছেন,, তা একমাত্র সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস ও ত্যাগী ভক্তদের জন্য, যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রতে চান।

জঘন্য কাজ করলেই যে ভগবানের পথ থেকে সে জন্মের মত বঞ্চিত হবে এমন কোন বিধি নাই। ঠিক ঠিক অনুতাপ হ'লে কেঁদে কেউ যদি প্রার্থনা জানায়—আর পাপ করব না, তবে সেও কৃপা পেতে পারে। তাই কত হীন ও জঘন্য কাজের পরও শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ও দেবেনকে ঠাঁই দিয়েছিলেন তাঁর অভয় চরণে।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ও অজগর বৃত্তি

(সরলতার প্রতিমূর্তি বিজয়কৃষ্ণ সঙ্গে)

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়-কৃষ্ণ শান্তিপুরের অদ্বৈত মহাপ্রভু বংশের দশম পুরুষ। কিংবদন্তি, ইনি বাল্যে গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের সাথে একসঙ্গে খেলতেন, মাঝে মাঝে খেতেনও শ্যামসুন্দরের সঙ্গে। ইনি কৈশোরে দল পাকিয়ে গুণ্ডা দমন করেছেন, সমাজ সেবা করেছেন এবং প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে অত্যাচারের প্রতিরোধ করেছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ চিবার্স যখন বাঙালীদের কটুক্তি করেন এবং একটি বাঙালী ছাত্রকে চোর আখ্যা দিয়ে পুলিসে দেন তখন তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন—তীব্র আন্দোলন, সেই আন্দোলনের উপদেষ্টা হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ব্যাপারটা গভর্ণর লর্ড বিডনের সম্মুখে উপস্থিত করেন তখন লর্ড বিডন ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ডাঃ চিবার্সকে লিখিত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবার নির্দেশ দিলে আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। ইনি ব্রহ্মকে লাভ করবার জন্য পৈতা ফেলে দিয়ে রীতিমত ব্রাহ্ম হয়ে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ব্রাহ্ম প্রচারক তৎপর আচার্যের কাজের ভার গ্রহণ করে বিবিধ প্রকারের উপাসনাদি করেও প্রকৃত "ব্রহ্মের" সন্ধান না পেয়ে মনঃকষ্টে দিন অতিবাহিত করার সময় ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পরামর্শে তাঁর (কেশব সেনের) সাথে এলেন দক্ষিণেশ্বর, প্রকৃত শান্তি পাবার আশায়। তারপর থেকেই রীতি-মত ভাবে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া আসা করছেন বিজয়। একদিন ঠাকুর সরলতার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন—আলোচনা

কালে ঠাকুর বললেন, আর দেখ এই সরলতার প্রতিমূর্তি বিজয়-কৃষ্ণকে। ঠাকুর পুনঃ বলছেন, আহা বিজয়কে দেখ কেমন উদার সরল। বিজয় বলছেন, ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করছি, কিন্তু ভাবভক্তি কিছু আসছে না, কেবল চিন্তা—কি করে যাবে এই প্রাণের শুষ্কতা; মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে একটি কুলিকে সম্মুখে পেয়ে তাকে প্রণাম করলাম, পুনঃ ভাব পেয়ে উপাসনায় বসলাম।

আর একদিন বিজয় এসেছেন, ঠাকুর খুব খুশি। কথায় কথায় রামকৃষ্ণ বলছেন বিজয়কে, তোমরা অত পাপ পাপ কর কেন? একশো বার আমি পাপী, আমি পাপী, বললে তাই হয়ে যায়। তারপর বলছেন ঠাকুর, এমন বিশ্বাস করা চাই যে তাঁর নাম করছি আমার আবার পাপ কি? তিনি আমার বাবা মা, তাঁকে বলো, যে পাপ করেছি আর কখনও করব না। আর তাঁর নাম কর—জিহ্বা পবিত্র হয়ে যাবে। দেহমন পবিত্র হয়ে যাবে। পাপ পাখি উড়ে পালাবে দেহবৃক্ষ থেকে। পাপ ও পাপীর কথা-প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ এক ভক্তকে বলছেন, তোদের এখন যৌবনের বন্যা, তাই পারছিস না বাঁধ দিতে। বন্যা যখন আসে তখন কি আর বাঁধ মানে? তার পরই তিনি বলছেন, তবে তোকে বলি শোন, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। ভক্তটি বলল, নয়? ঠাকুর বললেন, না। ওগুলি শরীরের ধর্মে আসে যায়। মনে যদি কুভাব এসে পড়ে তাতে ঘাবড়াবি কেন? কিভাব এল গেল নজরও দিবিনে, শুধু হরি নাম করবি, আর প্রার্থনা করবি, দেখবি আস্তে আস্তে সব বাঁধ মেনেছে। তার পরই ঠাকুর বলছেন, নিজেকে মেয়ে বলে ভাব, এও একটা কামজয়ের উপায়। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে কামভাব নষ্ট হয়ে যায়। পুনঃ তিনি বলছেন, মনই সব জানবে। জ্ঞানই বল আর অজ্ঞানই বল—সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ আর মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান। সংসারী জীব মনেতে সর্বদা ভগবানকে স্মরণ,

মনন করতে পারলে তাদের আর অন্য সাধনের দরকার হয় না। যারা সংসারের মধ্যে থেকেও মাকে ডাকতে পারে তারাই প্রকৃত বীর সন্তান।

ঈশ্বর তোমার বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো। বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? এমন বন্ধুকে যদি না চেন তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব। তারপরই ঠাকুর বলছেন, মনের কথা বলে প্রাণ খোলসা করতে পার এমন বন্ধু কে আছে ঈশ্বর ছাড়া? আর যাকেই বিশ্বাস করে বলবে তোমার মনের কথা, কদিন পরে দেখবে সে কথা বাজারে বিকোচ্ছে। মতে মতে মিলনই বন্ধুতা নয়, এক উদ্দেশ্য, এক দল, এক বাণিজ্য, এও বন্ধুত্ব নয়। আজকের বন্ধু, কালকে কালসাপ। তাই একমাত্র যিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁর সাথে কথা বলার মানেই সরল হয়ে যাওয়া। আর যে সরল সেই সত্যবাদী। এর পরই ঠাকুর বিজয়কে বলছেন, তুমি সাকারবাদীদের সাথে মেশো, তাই তোমার নাকি নিন্দে হচ্ছে? বিজয় চুপ করে রইলেন। রামকৃষ্ণ বলছেন, যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি। জাগ্রতে স্বপ্নে সে চিরস্থির, একাবস্থা। তোমাকে কত কি বলবে, কত নিন্দে, কত কটূক্তি করবে, যেহেতু তুমি আন্তরিক ভাবে ভগবানকে চাও, তুমি সহ্য করবে। টলবে না গলবে না।

বিজয় হাসলেন। পুনঃ ঠাকুর বলছেন, দুষ্টলোকের মধ্যে থেকেও কি ঈশ্বরচিন্তা হয় না? তারপরই তিনি সরল শিশুর মত বললেন, দেখ না, বনের মধ্যে ঈশ্বরকে কেমন ডাকতেন ঋষিরা। চারিদিকে বাঘ ভাল্লুক, তবু সাধনা থেকে নিবৃত্তি নেই। যেমন নিন্দুক আছে, তেমন সৎসঙ্গও আছে; মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ করা দরকার। তদুত্তরে বিজয় বললেন, সময় কই? কাজে আবদ্ধ হয়ে আছি। তোমার আচার্যের কাজ, অন্যের ছুটি হয় কিন্তু আচার্যের ছুটি নেই, বললেন ঠাকুর। বিজয় বললেন, ছুটি নেই? ঠাকুর বললেন, আচার্যের নেই। দেখনি, নায়েব যদি একবার শাসন

করতে পারে, জমিদার তাকে আরেকবার শাসন করতে পাঠায়। এরপর বললেন বিজয়, আপনি একটু আশীর্বাদ করুন। ঠাকুর বললেন ও সব অজ্ঞানের কথা, আমি কে? আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন। লোকলজ্জা ত্যাগ করে সেই 'সন্তের' নামকীর্তন কর, তুমিই তো চলমান তীর্থ। এখানে ঠাকুর সুন্দর ভাবে মহর্ষি নারদের তপস্যার ইতিকথা ব্যক্ত করে বলার পর বললেন, আমিও প্রথম চোখ বুজে ধ্যান করতাম। তারপরই বিজয়কে বললেন, শেষে ভাবলুম চোখ বুঝলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই এ কখনও হতে পারে? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীব-জন্তু, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য-তারা, তৃণ—সব তিনি। তাই ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর নাবালকের অছি, ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায়, সে তাই পায়। তারপরই ভাবাবেগে বললেন, ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শান্তি। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়। তাই মা মা করো।

আর একদিন ঠাকুরের কাছে বিজয় এসেছেন, নরেনও উপস্থিত। কথায় কথায় বিজয় বললেন, কে একজন সদা সর্বদা আমার সঙ্গে থাকেন, আমি দূরে থাকলেও তিনি জানিয়ে দেন কোথায় কি হচ্ছে। এই কথা শুনে নরেন বললেন, ঠিক গার্ডিয়ান এঞ্জেলের মত, তাই না? এরপর বিজয় ঠাকুরকে লক্ষ্য করে নরেনকে বললেন, জানো, আমি ঢাকায় এঁকে দেখেছি। ঢাকায়?—নরেন যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বিজয় বললেন, শুধু ছায়া দেখিনি, গা ছুঁয়ে দেখেছি, টিপে টিপে দেখেছি। এই কথা শুনে নরেন ঢোঁক গিলে বললেন, আপনার কথা বিশ্বাস করি না, একথা বলতে বাধ বাধ ঠেকছে, কেন না আমি নিজেই এঁকে দূরে বসে দেখেছি অনেকবার। ঠাকুর হেসে বললেন, সে তবে আর একজন। এই কথাবার্তার পর ঠাকুর শ্রীমাকে গোপনে বললেন, আত্মাটা যে বেরিয়ে যায় দেহ থেকে, এ ভাল নয়, দেহ বুঝি আর বেশী দিন থাকবে না। বিজয়

আর একদিন এসেছেন। বৈরাগ্য সম্বন্ধে কথাবার্তার সময় ঠাকুর বলছেন, তীব্র বৈরাগ্য মানে দুঃসাহসিক অনুরাগ ও শরণাগতি। শরণাগতি মানে হাত জোড় করে থাকা নয়, শরণাগতি মানে হচ্ছে, শরণে আগতি—এগিয়ে গিয়ে রোক করে ধরা ও ধরে থাকা। এরপরই ঠাকুর একটি রসাল গল্প বললেন—কি ভাবে স্ত্রীর সাথে কথা কইতে কইতে কেমন করে সন্ন্যাসী হতে পারা যায়। পরনের কাপড়খানা দুখণ্ড করে কেটে কৌপিন করে পরে, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করলেন। তাই ঠাকুরের কথা—রোক চাই এবং চাই বিশ্বাস ও অনুরাগ। রোক না থাকলে কোন মহৎ কাজই হয় না বা হতে পারে না।

এরপর ঠাকুর বিগ্রহগড়া ও চিত্রপট আঁকা নিয়ে বিজয়ের সাথে আলোচনা কালে বললেন, মামুলি নিয়মকানুন মেনে বিগ্রহ গড়লে বা চিত্রপট আঁকলেই চলবে না, তাতে মেশাতে হবে কারুকারের ভাব-লাবণ্য ও ভক্তির পবিত্রতা। বিজয় বললেন, চিত্রপট ভাব-শুদ্ধরূপে আঁকা উচিত, আজকাল বিশেষ আর ভাবশুদ্ধি দেখা যায় না। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, এঁড়েদায় মন্দিরের বারান্দায় যে চিত্রপট আছে দেখেছ? বিজয় দেখেন নাই বললেন। ঠাকুর বললেন, ঐ চিত্রপট ঠিক ঠিক আঁকা, একবার গিয়ে দেখে এস। তদুত্তরে বিজয় বললেন, আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তবে যেতে পারি। উত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন, বেশ তো যাবো। তারপরই বলছেন ঠাকুর, তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ও আন্তরিকতা ছিল অত্যধিক যা এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ রামকৃষ্ণের প্রভাব বিজয় কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ ব্যাপারে কম সহায়তা করে নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন রামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত হবার পরেই ব্রাহ্ম সমাজে এক তীব্র বৈরাগ্যের স্রোত প্রবাহিত হবার সূচনা হয়েছিল এবং তারই ফলে ১৮৭৬ খৃঃ

—অঘোরনাথ যোগপথ ও বিজয়কৃষ্ণ ভক্তিপথ অবলম্বন করে ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সর্বদাই দক্ষিণেশ্বর যেতেন এবং ঠাকুরের নিকট আশীর্বাদও প্রার্থনা করতেন। রামকৃষ্ণের উপরে তাঁর আকর্ষণ এত বেশী ছিল যে, এঁড়েদায় পট দর্শন করবার জন্যে রামকৃষ্ণকে অনুরোধ জানালেন—আপনি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যান তবেই যাওয়া হয়। তিনিও আনন্দিত মনে বললেন, বেশ তো যাব। অন্তরের ভাব না থাকলে পর এরূপ ভাবে কেউ কাউকে অনুরোধ জানাতে পারে কি? অতি প্রিয়জনই প্রিয়জনকে এরূপ অনুরোধ জানাতে পারে। অতএব বাঙলার এই দুই শ্রেষ্ঠ মানুষের অর্থাৎ মহামানবের ভিতর ছিল অন্তরের যোগসূত্র, তাই একজন আরেকজনের দর্শন প্রায় সময়ই প্রার্থনা করতেন। একজন স্নেহপ্রার্থী ছিলেন, আর একজন ছিলেন আশীর্বাদক।

এলেন দুজনে এঁড়েদায় একদিন। কিন্তু মন্দিরে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কখন খুলবে কেউ ঠিক বলতে পারছে না। পূজারী সামনের দিকের দরজা ভিতরের দিক দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে চলে গিয়েছে, কখন ফিরবে কে জানে। দুজনেই মন্দিরের বাইরে থেকে প্রণাম করলেন। কাছেই কোন এক বৈষ্ণবের সমাধি স্থান আছে, তাই গেলেন দর্শন করতে। ফিরে এসে দেখেন এখনও মন্দির বন্ধ! মন্দিরের আঙিনার পাশে ছোট একখানি ঘর, তাতে বসলেন দুজনে, ঠাকুর গান ধরলেন আর বিজয়কৃষ্ণ ভাবাবেগে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন আঙিনায়। মুহূর্তে কি হ'ল কে জানে, মন্দিরের দরজা খুলে গেল। সে কি, পূজারী ফিরে এল নাকি? না, পূজারী তো আসে নাই, মন্দিরের পেছনের দরজায় তেমনি তালা বন্ধ আছে। কতক্ষণ পরে পূজারী ফিরে এসে তো হতভম্ব—মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল কি করে? ব্যাকুলতায় খুলেছে, এ তো বাইরের টান নয়, এ যে ভিতর থেকে ঠেলা। ওরা শুধু দেখতে আসেনি, কতক্ষণ ওরা বসে থাকবে তাই দেবতাই নিজে দরজা খুলে

দিয়েছেন। পূজারী ঠাকুর প্রসাদীমালা রামকৃষ্ণ ও বিজয়ের গলায় পরিয়ে দিল।

এই দেখ সেই চিত্রপট। বারান্দায় রক্ষিত সেই মনোনীত ছবিটি বিজয়কে দেখালেন ঠাকুর। আর একদিন ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, প্রেম কাকে বলে? রামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরে যার প্রেম হয় তার জগৎ ভুল হয়ে যায়, এত যে প্রিয় দেহ তা পর্যন্ত হুঁস থাকে না। তার পরই বিজয়ের প্রসঙ্গে তিনি বললেন, বিজয় এখন বেশ হয়েছে, হরি হরি বলতেই মাটিতে পড়ে যায়। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলেই একেবারে সাষ্টাঙ্গ। আর অতি উদার সরল। সরল না হলে কি ঈশ্বরের কৃপা হয়? সিঁথির ব্রাহ্ম মন্দিরে ঠাকুর এসেছেন, বহু ব্রাহ্মভক্ত, বিজয় এবং বিজয়ের-শাশুড়ী ঠাকুরাণীও এসেছেন। সদরওয়ালা জিজ্ঞাসা করছেন, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য কি? শুনে রামকৃষ্ণ বলছেন, তুমি বেঁচে থাকতে থাকতে ধর্মোপদেশ দেবে, ভরণপাষণ করবে। যদি সতী হয় তোমার অবর্তমানে তার খাবার যোগাড় করে রাখতে হবে। তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে আর কর্তব্য থাকে না। যখন জমিদার নাবালক ছেলে রেখে যায় তখন "অছি" সেই নাবালকের ভার নেয়, এসব আইনের ব্যাপার তুমি তো সব জান। সদরওয়ালা হাঁ বলে সম্মতি জানালেন। এই কথা শুনে বিজয়কৃষ্ণ বলে উঠলেন, আহা! আহা! কী কথা! যিনি অনন্য মন হয়ে তাঁর চিন্তা করেন, যিনি তাঁর প্রেমে পাগল তাঁর ভার ভগবান নিজে বহন করেন, নাবালকের অমনি "অছি" এসে জোটে। আহা! কবে সেই অবস্থা হবে? যাদের হয় তারা কী ভাগ্যবান! ত্রৈলোক্য (ব্রাহ্মভক্ত)—মহাশয়, সংসারে যথার্থ কি জ্ঞান হয়? ঈশ্বর লাভ হয়? ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, কেন গো, তুমি তো সারেমাতে আছো। ঈশ্বরে মন রেখে সংসারে আছো তো? কেন সংসারে হবে না? অবশ্যই হবে। ত্রৈলোক্য তখন জিজ্ঞাসা করলেন, সংসারে জ্ঞান লাভ হয়েছে তার লক্ষণ কি? ঠাকুর সকলকে বলছেন, হরিনামের ধারায় আসে পুলক, তাঁর মধুর নাম

শুনেই শরীর রোমাঞ্চিত হবে, আর চক্ষু দিয়ে ধারা বেয়ে পড়বে। তার পরই ঠাকুর বলছেন, যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনীকাঞ্চনে ভালবাসা থাকে ততক্ষণ দেহ বুদ্ধি যায় না; বিষয়াসক্তি যত কমে ততই আত্মজ্ঞানের দিকে যেতে পারা যায় আর দেহ বুদ্ধি কমে। বিষয়াসক্তি একেবারে চলে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা আলাদা ও দেহ আলাদা বোধ হয়। বহুক্ষণ আলোচনার পর ব্রাহ্ম ভক্তেরা বললেন, বেশ চমৎকার আলাপ আলোচনা হোল। তদুত্তরে রামকৃষ্ণ বললেন, কি এলোমেলো বকলুম, তার পরই বলছেন, আমার ভাব কি জান? আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী; আমি বাড়ী তিনি ইঞ্জিনিয়ার, আমি রথ তিনি রথী, যেমন চালান তেমনি চলি, যেমন করান তেমনি করি। এরপর ত্রৈলোক্যনাথ গান ধরলেন সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল বেজে উঠলো, রামকৃষ্ণও প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন আর বারংবার ভাবাবেশে সমাধিস্থ হচ্ছেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গানে আখর দিচ্ছেন। গান হচ্ছিল 'নাচ মা ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে, আপনি নেচে নাচাও গো মা' ইত্যাদি, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মাতৃগতপ্রাণ রামকৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা, সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য। ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম ভক্তেরা ঠাকুরকে বেষ্টন করে নৃত্য করছেন আবার অনেকে বালকের ন্যায় মা! মা! বলে কাঁদছেন। কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করেছেন, সান্ধ্যকালীন উপাসনা কিন্তু এখনও আরম্ভ হয় নাই, কীর্তনের জন্য সমস্ত নিয়ম কোথায় ভেসে গেল। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ এবার বেদীতে বসে উপাসনা করবেন। রাত্রি তখন ৮টা, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন মন্দিরের মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন, সম্মুখ বিজয়। বিজয়ের শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী ও অন্যান্য মেয়ে ভক্তরা তাঁকে (ঠাকুরকে) দর্শন করবেন বলে এসেছেন। ঠাকুর অপর ঘরে গিয়ে তাদের সাথে কিয়ৎক্ষণ আলাপ করে ফিরে এসে বিজয়কে বলছেন, দেখ, তোমার শ্বাশুড়ীর কী ভক্তি! বলে সংসারের কথা আর বলবেন না, এক

ঢেউ যাচ্ছে আর এক ঢেউ আসছে। ঠাকুর বললেন, ওগো তোমার তাতে কি? তোমার তো জ্ঞান হয়েছে। তাতে তোমার শ্বাশুড়ী বললেন, আমার আবার কি জ্ঞান হয়েছে? এখনও বিদ্যার মায়া ঠিক হয় নাই, শুধু অবিদ্যার পার হলে তো আর হবে না, বিদ্যার পার হতে হবে তবেতো জ্ঞান হবে। তার পরই বললেন, আপনিই তো ঐ সব কথা বলেন। বেণী পাল এসে বললেন, উপাসনার সময় উপস্থিত। বিজয় ভাবছেন, উপাসনা করতে বেদীতে বসবেন কিনা? তার পরই রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি অনুমতি করুন তবে আমি বেদীতে গিয়ে বসবো। ঠাকুর বললেন, অভিমান গেলেই হলো। আমি লেকচার দিচ্ছি তোমরা শুন, এ অভিমান না থাকলেই হলো। অহঙ্কার জ্ঞানে হয় না, অহঙ্কার অজ্ঞানে হয়। যে নিরহঙ্কার তারই জ্ঞান হয়। যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হয় না, আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে আসতে হবে। বাছুর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে—চামড়ায় জুতা হয়, ঢাক ঢোলের চামড়া হয়, সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধুনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয় আর ধুনুরীর তাঁত তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) বলতে থাকে তখন নিস্তার হয়। এখন আর হাম্বা হাম্বা করছে না, বলছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা, আমি অকর্তা, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমিই সব। তার পরই পরমহংসদেব বললেন, গুরু—বাবা—কর্তা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে! আমি তাঁর ছেলে, চিরকাল বালক, আমি আবার বাবা কি? ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। যদি কেউ আমায় গুরু বলে—আমি বলি দূর শালা, গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই গুরু নেই, তিনি একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী। ঠাকুর বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আচার্যগিরি করা বড় কঠিন, ওতে নিজের হানি হয়। অমনি দশজন মানছে দেখে, পায়ের উপর

পা রেখে বলে, আমি বলছি তোমরা শুন। এই ভাবটা বড় খারাপ, তার ঐ পর্যন্ত। ঐ একটু মান। লোকে হুদ্দ বলবে, আহা! বিজয়বাবু বেশ বললেন আর লোকটা খুব জ্ঞানী। এর পরই ঠাকুর বলছেন, আমি মাকে বলি, মা, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি। বিজয় এবার বিনীত ভাবে বললেন, আপনি বলুন তবে আমি গিয়ে বসবো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, চাঁদা মামা সকলেরই মামা, তুমিই তাঁকে বলো। যদি আন্তরিক হয় কোন ভয় নাই। বিজয় আবার অনুনয় করাতে রামকৃষ্ণদেব বললেন, যাও, যেমন পদ্ধতি আছে তেমন করগে, আন্তরিক ভক্তি তাঁর উপর থাকলেই হোল। বিজয় ব্রাহ্ম সমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করছেন ও মধ্যে মধ্যে মা! মা! বলে ডাকছেন। ভোজনান্তে ঠাকুর বিজয়কে একান্তে ডেকে নিয়ে বলছেন, তুমি মা! মা! বলে প্রার্থনা করছিলে। এ খুব ভাল। কথায় বলে মায়ের টান বাপের চেয়েও বেশী। মায়ের উপর জোর চলে, বাপের উপর চলে না। বিজয় ভাবাবেগে জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্ম যদি মা—তাহা হলে তিনি সাকার না নিরাকার? ঠাকুর বললেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়—তখন ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই সব কাজ করেন তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলছে দুলছে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী সাকার আবার নিরাকার। তোমাদের যদি নিরাকারে বিশ্বাস—কালীকে সেই রূপে চিন্তা করবে। বিশ্বাস কর সব হয়ে যাবে। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (গোঁড়ামী) কর না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে, তিনি এই হতে পারেন বা এই হতে পারেননা। বলো আমার বিশ্বাস—তিনি নিরাকার, আরও কত কি হতে পারেন, তিনিই জানেন। আমি জানি না বুঝতে পারি না, মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝা যায়? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে

দেন তবে বুঝা যায় নচেৎ নয়। এর পরই রামপ্রসাদের একটা গানের অংশ তুলে ধরলেন—'আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' এই শুনে বিজয় বললেন, ধর্মাধর্ম ত্যাগ করলে কি বাকী থাকে ? রামকৃষ্ণ বললেন—শুদ্ধা ভক্তি। তার পর ঠাকুর বললেন—আমি মাকে বলেছিলাম, মা, এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। দেখ, জ্ঞান পর্যন্ত আমি চাই নাই, ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি, অচলা, নিষ্কাম ও অহৈতুকী ভক্তি বাকী থাকে। তার পরই বললেন, পূর্ণ জ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়, তাই অহং তত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয় মুখে বলা যায় না, সেখানে আমি তুমি নেই ; যতক্ষণ আমি তুমি আছে, ততক্ষণ প্রার্থনা কি ধ্যান করছি এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনছেন এ জ্ঞানও আছে আবার ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধও আছে। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি মা আমি ছেলে, এই ভাব থাকলেই পূর্ণ জ্ঞান জন্মে। তিনি আমাদের ভেতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর 'আমি' আর যায় না, তাই যতক্ষণ আমি আছে, ভেদবুদ্ধিও আছে—ব্রহ্মনির্গুণ বলবার যো নেই ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে। বিজয় এই কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এই আদ্যাশক্তি দর্শন এবং ব্রহ্মজ্ঞান কি উপায়ে হতে পারে ? ঠাকুর বললেন, ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করো আর কাঁদো, চিত্ত শুদ্ধি হয়ে যাবে। নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। ভক্তের 'আমি রূপ' আর্শিতে সেই সগুণরূপ আদ্যাশক্তিকে দর্শন করবে কিন্তু আর্শি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও সেই প্রতিবিম্বকে ধরে সত্য সূর্যের দিকে যাও। সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন, তাঁকেই

বলো, তিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন—কেননা তিনিই সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি শক্তি তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। মা ব্রহ্মজ্ঞানও দেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আর এক পথ আছে জ্ঞানযোগ, বড় কঠিন পথ। ব্রাহ্ম সমাজের তোমরা জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। যারা জ্ঞানী তাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা স্বপ্নবৎ। আমি তুমি সব স্বপ্নবৎ। এর পর তিনি বিজয় প্রভৃতিকে একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে রাত্রি ১০টার পর দক্ষিণেশ্বর রওনা দিলেন (১৮৮৪, ১৯শে অক্টোবর)।

ঠাকুর বলেন, যখন বাইরের লোকের সাথে মিশবে তখন সকলকে ভালবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে থাকতে পার, বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে না। ও ব্যক্তি সাকার মানে—নিরাকার মানেনা ও নিরাকার মানে—সাকার মানে না, ও হিন্দু ও মুসলমান ও খৃষ্টান এই বলে নাক সিটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন, সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সাথে মিশবে যতদূর পার। আর ভালবাসবে। জ্ঞানদীপ জ্বেলে—ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখোনা! নিজের ঘরে স্বরূপকে দেখতে পাবে ঠাকুর বললেন, রাখাল যখন গরু চরাতে যায় গরু সব মাঠে এক হয়ে যায়। এক পালের গরু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে যায় আবার পৃথক হয়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে। ঠাকুর রওনা দেওয়ার সময় বেণী পাল রাখালের জন্য খাবার দিতে চাওয়ায় ঠাকুর বললেন—তার ঐসব নিতে নেই। বেণী আশীর্বাদ চাইলে ঠাকুর বললেন, দেখ, অর্থ যার দাস—সেই মানুষ, যারা অর্থের ব্যবহার জানে না তারা মানুষ হয়েও মানুষ নয়, আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার। ধন্য তুমি, এতগুলি মানুষকে আনন্দ দিলে।

ঠাকুরের অসুখ, ঢাকা থেকে বিজয় এসেছেন ঠাকুরকে দেখতে, অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বিজয় বলছেন, আমি বুঝেছি আপনি কে?

আর বলতে হবে না—এই বলে বিজয় ঠাকুরের পদে লুটিয়ে পড়লেন। রামকৃষ্ণ তখন ঈশ্বরাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে আছেন এবং ভাবাবেশে তাঁর পাখানা বিজয়ের গায়ে তুলে দিলেন। অবশ্য এরূপ করার জন্য তৎপরদিবস ২৬শে অক্টোবর ১৮৮৫ খৃঃ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নিকট দুঃখ করে বলছিলেন, ঐ অবস্থায় 'ভাবে' বিজয়ের বুকে পা দিলুম। এদিকে বিজয়কে এত ভক্তি করি—সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি? ডাক্তার বললেন, সাবধান হওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ হাত জোড় করে বলছেন, আমি কি করবো? সেই অবস্থা এলে বেহুঁস হয়ে যাই, কি করি কিছুই জানতে পারি না। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে যেমন ভালবাসতেন তেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। তাঁকে দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্মের যাতে বহু কার্য হতে পারে তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপদেশ দিতেন। বিজয় ব্রাহ্মধর্ম থেকে পৃথক হবার পর আধ্যাত্মিক গভীরতা দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হচ্ছিল, কীর্তনকালে ভাবাবিষ্ট হয়ে উদ্দামনৃত্য, ঘন ঘন সমাধি দেখে লোক মোহিত হোত। তাই ঠাকুর বলতেন, যে ঘরে প্রবেশ করলে লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তার পাশের ঘরে বিজয় পৌঁছে দ্বার খুলে দেবার জন্য করাঘাত করছেন।

দক্ষিণেশ্বরে কীর্তনের পর বিজয় চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না, কোথায় পড়ে গিয়েছে। ঠাকুর বলছেন, এখানেও একটা হরিবোল খায়, পুনঃ হেসে বলছেন, ওসব আর কেন? এর ভাবার্থ—এখনও তুমি চাবি চাবি কর কেন? চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আর কেন? এর পর থেকেই আরম্ভ হোল বিজয়ের আকাশ-বৃত্তির মহড়া। বিষয়টা একটু স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করা ভাল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে তাঁর সন্ন্যাস জীবনে আকাশ-বৃত্তি বা অজগর বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন—এও রামকৃষ্ণের শিক্ষা। বিজয়কৃষ্ণ সন্ন্যাসী হবার পর ১৮৮৪ খৃঃ ৯ই নভেম্বর দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তরাও তথায় উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, দেবার সেই ঈশ্বর।

তারপর তিনি বললেন, একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছু টাকা আনতে গিয়েছিলেন, বাদশা তখন নামাজ পড়ছেন আর বলছেন—হে খোদা, আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির তখন চলে যাবার উপক্রম করলে—আকবর শা তাঁকে বসতে ইসারা করলেন। নামাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন যাচ্ছিলে? সে বললো, আপনিই বলছিলেন—ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবছিলাম, যদি চাইতে হয় তবে ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইব। এই শুনে বিজয় বললেন, গয়ায় এক সাধু দেখেছিলাম—নিজের চেষ্টা নেই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হোল। দেখি, কোথা থেকে মাথায় করে ময়দা ঘি এসে পড়ল, ফলটলও এলো। এই কথা শুনে বিজয়কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বললেন, সাধু তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যাঁরা, খাবার জন্য চেষ্টা করেন না। মধ্যম ও অধম দণ্ডীফণ্ডী; যারা মধ্যম তারা নমো নারায়ণ বলে দাঁড়ায়, যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। উত্তমশ্রেণীর সাধুর অজগর বৃত্তি। বসে খাওয়া পাবে, অজগর নড়ে না। পুনঃ ঠাকুর বলছেন, দেহের সুখ দুঃখ আছেই, যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন প্রাণ, দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে অর্পণ করে। তারপর ঠাকুর বললেন, জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে, বিষয়ের কথা হোলে তার বড় কষ্ট হয়, বিষয়ীরা আলাদা লোক। এরপর বললেন, বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে, পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে তখন ঈশ্বর কথা বই শুনতেও পারে না আর বলতেও পারে না, তখন তার মুখ থেকে জ্ঞান উপদেশ বেরোয়। আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর ঠাকুর সংকীর্তানন্দে বিভোর, সন্ধ্যার পর ভক্তেরা সব উপস্থিত, ঘরে ডবল বাতি জ্বালান হয়েছে, বিজয়কে ঠাকুর বলছেন. তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন? এদিকে সরে এস। কীর্তন আরম্ভ হোল। ঠাকুর মাতোয়ারা হোয়ে নৃত্য করছেন, ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে ঘিরে খুব নাচছে, বিজয় নৃত্য করতে করতে দিগম্বর হোয়ে পড়েছেন, হুঁস

নেই। কীর্তন শেষ হবার পর বিজয় চাবি খুঁজছেন। কোথায় পড়ে গিয়েছে, তাই ঠাকুর বললেন—এখানেও একটা হরিবোল খায়। বলে হেসে বলছেন, ওসব আর কেন ? এর পর থেকেই বিজয়ের ঘোরতর পরিবর্তন দেখা যায়। অজগর বৃত্তি তো তিনি গ্রহণ করেছিলেনই অধিকন্তু আধ্যাত্মিক জীবনেও তিনি বহু উর্ধে উঠে ছিলেন।

আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভের পর বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্র-শিষ্য করেছিলেন এবং ঠাকুরের দেহরক্ষার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে পুরীধামে দেহ রক্ষা করেন।

বিজয়কৃষ্ণ অন্তরে প্রকৃত শান্তি না পেয়ে এবং সদ্‌গুরু বরণ করতে না পেরে ভারতের চতুর্দিকে ঘুরেছেন, অবশ্য এর পূর্বে তিনি তিন বার দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামীর কাছ থেকে ; ১৮৬৩ খৃঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তৎপর ১৮৭৬ খৃঃ কেশব সেনের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন যখন ১৮৬৬ খৃঃ মুঙ্গেরে অবতার রূপে পূজিত হন, ব্রাহ্ম রমণীগণ যখন অবতাররূপে তাঁর পদ ধৌত করে আপন আপন কেশ- রাশি দ্বারা কেশবের পা মুছিয়ে দিতে লাগলেন, কেশব তখন তাদের বারণ তো করেনই নাই অধিকন্তু তিনি বলেছেন, আমি ভক্তির স্রোত বন্ধ করতে চাই না। এই অবতারবাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন হতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন, যে দেশে মাছ, কচ্ছপ অবতার—সেই দেশে কেশবের হঠাৎ অবতার হবার ইচ্ছা হল কেন ? রাজনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মবৃন্দ এই অবতারবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায়—এই প্রতিবাদ রীতিমত আন্দোলনে রূপায়িত হল এবং এই আন্দোলনে বিজয়কৃষ্ণও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তাই বিজয় প্রকৃত শান্তি লাভের আশায় ও সদ্‌গুরুর অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উল্কার ন্যায় ছুটে বেড়াতে লাগলেন।

সদ্‌গুরু লাভ করবার পূর্বে বিজয় কাপালিক, রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান ফকির ও বৌদ্ধ যোগীদের নিকট গিয়ে প্রকৃত বস্তু না পেয়ে ১৮৮৩ খ্রীঃ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে নানকপন্থী এক সাধুর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করেন। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে দীক্ষা ও কাশীধাম থেকে সন্ন্যাস লাভের পর বিজয় কলকাতায় এসে বরাহনগরে মণি মল্লিকের বাগানে ঠাকুরের সাথে দেখা করেন। রামকৃষ্ণ বিজয়কে দেখেই বললেন, এ কি ? তোমার যে গর্ভলক্ষণ হয়েছে। বিজয় তখন তাঁর দীক্ষা লাভের সমস্ত পরিচয় দেন। ঠাকুর শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পর বিজয় এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর অসুস্থ। ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের কাছে যেতে বিজয়কে বাধা দিতে লাগলেন কিন্তু ঠাকুর তখন হাততালি দিয়ে বিজয়কে ডাকতে লাগলেন। বিজয় সম্মুখে যাওয়া মাত্রই রামকৃষ্ণ বললেন—আহা, তোকে দেখে যে আমার হৃদ্‌পদ্মটি ফুটে উঠল। এই বলেই তিনি সমাধিস্থ হলেন। আর একবার বিজয় পশ্চিম অঞ্চলের বহুস্থান ঘুরে কলকাতায় এসে একদিন দক্ষিণেশ্বর গেলেন। রামকৃষ্ণ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—এত ঘুরে এলি, কোথায় কি রকম দেখলি বল দেখি ? বিজয় বললেন, কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা, কোথাও বারো আনা, চৌদ্দ আনাও দেখেছি কিন্তু ষোল আনা এখানে। রামকৃষ্ণ শুনেই ভাবাবেশে সমাধিস্থ হলেন।

রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে কী মধুর সম্বন্ধ, একজন বলছেন 'তুই' বলে আর একজন 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলে। একজন স্নেহের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর কথায়, ব্যবহারে ও উপদেশে, আর একজন সেই উপদেশ গ্রহণ করছেন। কেবল কি তাই, নিজের কথা ও অভিজ্ঞতা-গুলি নিবেদন করে যাচ্ছেন।

এখানে মনে প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক, যখন রামকৃষ্ণের সাথে বিজয়কৃষ্ণের এত আন্তরিকতা, তখন বিজয় শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসকে গুরু রূপে বরণ করলেন না কেন ? শিষ্য করার জন্য অনু-

রোধ বা প্রশ্ন করলেই ঠাকুর উত্তেজিত হয়ে বলতেন, দূর শালা, গুরু কিরে ? আমি বরং সকলের শিষ্য। সুতরাং বিজয়কৃষ্ণ ওদিক দিয়ে গেলেন না বা রামকৃষ্ণও তাঁকে শিষ্য করবেন এ চিন্তাও কখন করেন নাই, বরং বিজয় যাতে সনাতন হিন্দু ধর্মের মান উন্নত করতে পারেন, তজ্জন্য নিজের সন্তানদের বাইরে রেখে কাজ করবার প্রেরণা দিতেন এবং নিত্যগোপালকেও অনুরূপ ভাবে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ব্রাহ্ম প্রচারক ও আচার্য হিসাবে তিনি যা করতে পারেন নাই মাত্র ১৪ বৎসর কাল হিন্দু ধর্মে পুনঃ প্রবেশ করে সনাতন হিন্দুধর্মের তিনি অনেক কিছু করে গেছেন। বিজয়কৃষ্ণের আবির্ভাব, কার্যাবলী ও তিরোধান অলৌকিক। সরলতা ও সত্যই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

১৮৯৭ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিজয়কৃষ্ণ জটাজুটশোভিত অবস্থায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটি বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিজয়কৃষ্ণকে দেখা মাত্রই গাড়ীতে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করেন এবং বিজয়কৃষ্ণও হাত তুলে বিবেকানন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাই কেবল নয়, এগুলি এঁদের হৃদয়ের ভাব, কারণ তরুণ নরেন্দ্রনাথ যখন রামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত করতেন, তখন ব্রাহ্ম আচার্য রূপে বিজয়কৃষ্ণও ঠাকুরের কাছে কথামৃত শ্রবণ করতেন। সেই সময় থেকেই এঁদের ভেতর ছিল প্রবল আন্তরিকতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রস্থানের পর বিজয়কৃষ্ণ ও নিত্যগোপালের অভ্যুত্থান না হলে সনাতন হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মদের প্রাধান্য পুনরায় দেখা যেত। বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিখ্যাত ব্রাহ্মভক্ত বিজয়কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলেই ব্রাহ্মধর্ম পুনঃ মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয় নাই, বরং শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাদের সকল প্রচেষ্টাই আস্তে আস্তে বিফল হয়েছিল।

প্রমাণ্য গ্রন্থ

শ্রীম প্রণীত — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১—৫ খণ্ড)
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত লীলা প্রসঙ্গ (১—৫ খণ্ড)
" গম্ভীরানন্দ " শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা (১ম ও ২ খণ্ড)
" জগদীশ্বরানন্দ " স্বামী কৃষ্ণানন্দ
" " " " শিবানন্দ
উদ্বোধন প্রকাশিত — শ্রীশ্রীমায়ের কথা
" " — ভারতে বিবেকানন্দ
" " — শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি
" " — শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত
" " — শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতি কথা
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত — যুগে যুগে যার আসা
শ্রীঅর্চনা পুরী " — জননী সারদেশ্বরী
রাজর্ষি শ্রীমৎ সত্যদেব " — সাধন সমর (১—৪র্থ খণ্ড)
শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ শর্মা রচিত — শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা
শ্রীঅচিন্ত্য সেন " — পরম পুরুষ (১—৪র্থ খণ্ড)
" " " — কবি রামকৃষ্ণ
শ্রীগিরিজা প্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত — প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
আনন্দবাজার—সাময়িকী প্রভৃতি।